মহাজন বাক্য।

ঈশ্বর বলিতেছেন "আমার দিকে ফের, আমি তোমার দিকে ফিরিব।" উপবাস, রোদন ও শোকসহকারে বস্ত্র ছিন্ন করিলে কি হইবে, হৃদয় ছিন্ন করিয়া ফের। তিনি দয়াময় করুণার সাগর, সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

আমি যে উপবাস মনোনীত করিয়াছি তাহা এই—পাপের বন্ধন উন্মোচন করা, এবং অত্যাচারিতদিগকে অত্যাচার হইতে উদ্ধার করা।

বলিদান অপেক্ষা ন্যায়াচরণ ও সুবিচার প্রভুর গ্রাহ্য।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করে সেই ধন্য। কারণ সে নদীতীরে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় চির-বর্দ্ধনশীল।

হে ঈশ্বর! আমি তোমার নিকট দুইটী বস্তুর জন্য প্রার্থনা করিতেছি—আমাকে অধিক ঐশ্বর্য্য দিও না, পাছে অহঙ্কারী হইয়া আমি বলি 'তুমি কে?' আমাকে নিরন্ন করিও না, পাছে পরস্ব অপহরণ করি এবং তোমার নাম বৃথা উচ্চারণ করি।

প্রভুকে বিশ্বাস কর এবং সৎকর্ম্মশীল হও, তাহা হইলে ঈশ্বরে বাস করিবে এবং নিশ্চয়ই তাঁহার হস্ত হইতে আহার প্রাপ্ত হইবে।

কি আহার করিবে, কি পান করিবে, কি পরিধান করিবে, তাহার জন্য চিন্তিত হইও না।

আকাশের পক্ষিগণকে দেখ, তাহারা বীজ বপন বা শস্য ছেদন করে না এবং শস্যাগারে শস্য সংগ্রহও করে না। ঈশ্বর তাহাদিগকে আহার দেন।

সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার মহিমা অন্বেষণ কর, আর আর সমুদায় প্রয়োজনীয় বস্তু তিনি আপনা হইতেই প্রদান করিবেন।

ঈশ্বরের দয়া অপার ও অনন্ত। আমরা তাঁহাকে কতটুকু কৃতজ্ঞতা দান করিতে পারি? স্তব, স্তুতি, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন দ্বারা অনবরত তাঁহার গুণগান কর এবং হৃদয়তন্ত্রী তাঁহার প্রশংসাধ্বনিতে ধ্বনিত কর।

ঈশ্বর তোমাকে যে ধন দিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার গৌরব বর্দ্ধিত কর।

তোমার সমুদায় লাভের প্রথম ফল তাঁহার চরণে বিশেষরূপে উৎসর্গ কর।

নব বর্ষ।

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

(হে জীব সকল! উত্থান কর, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও এবং উৎকৃষ্ট

আচার্য্যের নিকট গমন করিয়া জ্ঞান লাভ কর।)

যত আয়ু বৃদ্ধি হইতেছে, তত আয়ুক্ষয় হইতেছে এবং ততই আমরা মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হইতেছি।

হায়! কি দুঃখের বিষয় যে, যে পরিমাণে বয়োবৃদ্ধি হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জীবন সেই পরিমাণে উন্নত হয় না, কিন্তু পাপ ও অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়া থাকে।

বৎসর পুরাতন ও নূতন হয়, কিন্তু ঈশ্বর চির-নূতন। তাঁহার মহিমা ও করুণা নিত্য নবভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

ধর্ম্মসাধনের জন্য ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিবে না। কোহি জানাতি কস্যাস্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি (কে জানে অদ্য কাহার মৃত্যু হইবে)।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন এদেশে বিদেশী পথিক ছিলেন, আমরাও সেইরূপ। আজই হউক, কালই হউক, তাঁহাদিগের ন্যায় আমরাও এথান হইতে চলিয়া যাইব।

হে প্রভু! আমরা যেন আমাদের গণা দিন স্মরণ রাখি এবং জীবনের প্রতিক্ষণ জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনে ও তোমার করুণা স্মরণে নিয়োজিত করি।

হে প্রভু! তুমি মনুষ্যজীবনকে অনিত্য ও অসার করিয়া তোমার জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছ, তাহা না হইলে নিত্য ও সারবস্তু যে তুমি, তোমাকে আমরা অন্বেষণ করিতাম না।

মনের মিল।

বয়স বাড়িতে চলিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে পারিলাম না। বার বার তিন বার চেষ্টা করিয়াও যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলাম, তখন একেবারে স্কুল ছাড়িয়া দিলাম। পিতার তিরস্কার ও তাড়না বৃথা হইল।

জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত রাগা-রাগী চলে, কিন্তু ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট পার নাই। পিতা দিঘা-ঘাট ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার। ত্রিশ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া সম্প্রতি তিনি উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করিয়া শত মুদ্রা অর্জ্জন করিতেছিলেন। কিন্তু আমার দুই ভগ্নীর বিবাহ দিয়া তিনি সমস্ত জীবনের বহুকষ্টসঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়াছিলেন।

শৈশবেই আমরা মাতৃহীন হই। পিতার এমনি কোমল প্রকৃতি যে, আমার বিবাহের সময় যথোচিত অর্থ আদায় করিয়া লইয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার পুরাতন বন্ধু গোয়ালন্দের ষ্টেশন-মাষ্টার ধরিয়া বসিলেন যে, কন্যাদায় হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে হইবে। তিনি তাহাতে দ্বিরুক্তি করিলেন না, একবার আমাদের অবস্থার

কথাও ভাবিলেন না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দুশ্চিন্তা ও মনোবেদনা বোধ হয় তিনি তখনও ভুলিতে পারেন নাই। সুতরাং কপর্দ্দক গ্রহণ না করিয়াই আমার মাথায় তিনি এক গুরুতর বোঝা চাপাইয়া দিলেন।

আমি মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ হইলাম। একে বিবাহে আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। অর্থের অভাবে সংসারে যে কত কষ্ট, কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলাম। এ অবস্থায় আর একজনের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে আমি একেবারেই অনিচ্ছুক ছিলাম। তাহার উপর, সে কন্যা যদি বা কিছু সঙ্গে আনিত, বিষয় না হউক, অন্ততঃ যদি বা কিছু টাকাও পাইতাম, তবুও কোন প্রকারে চুপ করিয়া থাকিতাম।

এ বিবাহে ক্ষুব্ধ হইবার আরও কারণ ছিল। শেষে কি না আমাকে ষ্টেশন-মাষ্টারের কন্যা বিবাহ করিতে হইল! একে ত আমি ষ্টেশনের নামে বিরক্ত—সেই টিকিট লইবার ঘন্টা, যাত্রীদের কোলাহল, এঞ্জিনের হুইসিল, গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ শুনিতে শুনিতে প্রাণান্ত। কোথায় অভ্যাস বদলাইব—সহরের স্ত্রী বিবাহ করিয়া তাহার নিকট সহরের খোস্ গল্প শুনিব—না, সেই পুরাতন কথা, সেই গার্ডের গল্প, সেই সিগ্‌ন্যালম্যানের বিপদের ইতিহাস। মনে করিলেই আমার হৃৎকম্প হইত। এইরূপ অবস্থায় পত্নীপ্রেম যে আমার প্রগাঢ় হইবে না, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

এমন সময় পিতার মৃত্যু হইল। অন্নসংস্থানের জন্য আমাকে চাকরীর উমেদারী করিয়া বেড়াইতে হইল। সুযোগ বুঝিয়া আমার উপর অদৃষ্ট এবার পূর্ণমাত্রায় প্রতিশোধ লইল। ভাগ্যদেবতা কেবল আমাকে ষ্টেশন-মাষ্টারের কন্যা বিবাহ করাইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, সহকারী ষ্টেশন-মাষ্টারের পদে আমাকে নিযুক্ত করিয়া তবে ছাড়িলেন।

অদৃষ্টের সঙ্গে বিবাদ করা বৃথা, ইহা বুঝিয়া আমি আমার কর্ম্মে মনঃসংযোগ করিলাম। দিনের বেলা আমাকে কিছুই করিতে হইত না, রাত্রিতেই আমার ডিউটী। রাত্রি ৭টার সময় একটা অপ্ প্যাসেঞ্জার আসিত। তারপর রাত্রি ৮৷১০ মিনিটের সময় একটা ডাউন প্যাসেঞ্জার কানপুর অভিমুখে চলিয়া যাইত। রাত্রি ১১টার সময় কোন কোন দিন একটা গুড্‌স্ ট্রেন আসিত। কিন্তু তাহার আসার কোন স্থিরতা ছিল না। মেল ঠিক রাত্রি ১২৷৫ মিনিটে আমাদের ষ্টেশন পাস্ করিয়া যাইত। ছোট ষ্টেশন বলিয়া সেখানে মেল থামিত না। প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলির পর্য্যবেক্ষণ বড় কষ্টকর নয়। সে গুলি ধীরে আসিত, ধীরে যাইত—বন্দোবস্ত করিবার অনেক অবসর থাকিত। মেল ট্রেনেই কেবল ভয়। সেটা রাক্ষসের মত খপ্ করিয়া আসিয়া পড়িত, আবার মুহূর্ত্তের মধ্যেই বিলীন

হইয়া যাইত। কেবল মেলের আগমনের সময়ই আমাকে সতর্ক থাকিতে হইত।

প্রথম প্রথম এ নূতন টকাজ আমার মন্দ লাগিল না। টেলিগ্রামের দ্বারা পার্শ্ববর্তী ষ্টেশন-মাষ্টারদিগের সহিত কথা-বার্ত্তা কহা, টিকিট দিবার সময় যাত্রীদের হুড়াহুড়ি দেখা, সিগ্‌ন্যালম্যানদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করা, বেশ ভালই বোধ হইত। তবে আমি বেশী কর্ত্তৃত্ব চালাইতাম না—নিজেই অনেক কাজ করিয়া লইতাম। বিশেষতঃ রাত্রিতে কুলীরা সব নিদ্রিত থাকিত। তাহাদের ঠেলিয়া তোলা এতই বিরক্তিকর যে, তাহাদের সামান্য কাজ করিয়া লওয়া ইহা অপেক্ষা অনেক সহজ বোধ হইত। লাইন ক্লিয়ার পাইলে আমি স্বহস্তেই সিগ্‌ন্যাল্ ফেলিতাম,সিগন্যাল উঠাইতাম। কুলিরা এই কারণে আমার নিকট বিশেষ বাধ্য ছিল।

কিন্তু কিছু দিন পরে আমার চঞ্চল মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সেই এক-ঘেয়ে কাজ, সেই তারের টুন্ টুন্ শব্দ, "গাড়ী ছোড়া হায়, ঘণ্টা লাগাও" বলিয়া ছেদি সিংকে হুকুম, যাত্রীদের সেই হুড়া-হুড়ি, হাতাহাতি, মারামারি, হুস্ হুস্ শব্দে ট্রেনের আগমন, ক্রমে আমার নিকট বড়ই বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল। চোক-বাঁধা বলদের মত আমি যেন নেশার ঝোঁকে আমার নিয়মিত কাজে ঘুরিতে লাগিলাম।

দিনের বেলা মনটা কেমন উদাস-ভাবে ছুটাছুটী করিতে থাকিত। বন্ধু-বান্ধব নাই, আত্মীয় পরিজন নাই যে তাহাদের সঙ্গে দুই দণ্ড গল্প করিয়া মনটাকে শান্ত করিব। বৃদ্ধ ষ্টেশন-মাষ্টারটি বড়ই গম্ভীর, গল্প সল্প করিতে বড় ভালবাসিতেন না। তাঁহার ২টী ছেলে ছিল। কিন্তু ছেলেদের প্রতি আমি আদৌ অনুরক্ত ছিলাম না। সুতরাং আমার দিনগুলি নিতান্তই কষ্টকর হইয়া উঠিল।

শেষে বিশ্বসংসারই আমার নিকট কেমন নীরস, কঠোর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। স্নেহের বন্ধন নাই, প্রেমের আকর্ষণ নাই, কার্য্যের তাড়না নাই, আমি আমার উদ্দেশ্য-হীন অলস জীবনটাকে লইয়া কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

এমন সময় আমার স্ত্রী ঘর করিতে আসিল। তিন বৎসর বিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু নিরুপমার সহিত এখনও পর্য্যন্ত আমার আলাপ পরিচয় হয় নাই। শুনিয়াছিলাম সে অতি সুন্দরী। ভগ্নীরা তাহার গুণেরও প্রশংসা করিত। বলিত, তাহার নিরুপমা নাম ব্যর্থ হয় নাই। কিন্তু অদৃষ্টের নিকট পরাজিত হইয়া বালিকার উপরই আমার আক্রোশটা পড়িয়াছিল, সুতরাং অন্ধের নিকট প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ যেমন ভাবহীন, সৌন্দর্য্য-হীন, আমার নিকট আমার পত্নীর গুণাবলীও তদ্রূপ হইয়াছিল। মনের মিল ত দূরের কথা, ষ্টেশন-মাষ্টারের

মেয়ে যে কখন আমার মন আকর্ষণ করিতে পারিবে, সে যে কখন আমার কোন কাজে লাগিবে, এমন ভরসা আমার ছিল না। মানব কি ভ্রান্ত!

কিন্তু এই জনহীন সঙ্গিহীন ষ্টেশনে তাহাকে পাইয়াও আমি পুলকিত হইলাম। মনের মতন নাই হ'ক, তবুও সে আপনার জিনিষ, মনের কথা নাই হ'ক, তাহার সহিত বাজে ঘর কন্নার কথা কহিয়াও যে সেই কর্ম্মহীন দীর্ঘ দিনগুলি কোন প্রকারে কাটাইতে পারিব, এ চিন্তা আমার পক্ষে কম সুখের নহে।

যৌবনে সকলেরই যেমন অবস্থা হয়, আমারও তদ্রূপ ঘটিল। অনেক দিন পরে নিজের স্ত্রীকে দেখিয়াই আমি চমকিত হইলাম। সেই বিজন স্থানে বৎসরেক কাল বঙ্গললনার সুকোমল মূর্ত্তি আমার দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। সহসা পত্নীর সেই লজ্জা-সঙ্কোচ-বিজড়িত কান্তি পূর্ণ মুখখানি দেখিয়া যে আমি মুগ্ধ হইব তাহাতে বিচিত্র কি?

কিন্তু আমি অবাক্ হইলাম। মানুষ এত বদলাইতে পারে, আমার এ ধারণা ছিল না। সেই ক্ষুদ্র একাদশ-বর্ষীয়া বালিকা বধূ যে এমন পূর্ণ বিকসিত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে, সেই শিশু-সুকোমল সুন্দর মুখখানি যে এমন নিরুপম সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। বর্ষা-কালে নদী যেমন কূল ছাপাইয়া পড়ে, নবযৌবন ও নবীন সৌন্দর্য্য তাহার সর্ব্বাঙ্গ তেমনি ছাপাইয়া পড়িতে'ছল।

এতদিনে আমি কাজ হাতে পাইলাম। কাজের গোলমালে দিনগুলি একরকম কাটিতে লাগিল। সকালে উঠিয়া দৈনিক বাজার হাট করিতে ও চাকরের সহিত বকাবকি করিতেই সময় কাটিয়া যাইত। দুপর বেলা স্ত্রীর সহিত দু'চারটা কথা কহিতে না কহিতেই সন্ধ্যা আসিয়া পড়িত।

ক্রমে ক্রমে নিরুপমার সহিত আমার বন্ধুত্ব জন্মিল। মনের ছবিতে তাহাকে যত কালো করিয়া চিত্রিত করিয়াছিলাম, দেখিলাম তা'র চেয়ে সে অনেক অধিক উজ্জ্বল। গার্ডের গল্প ছাড়াও সে অনেক গল্প জানিত, ট্রেনের কাহিনী ব্যতীত অন্য অনেক কাহিনী তাহার পুঁজি ছিল। সে যে অপদার্থ, অসার ও অকিঞ্চিৎকর নয়, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার অধিক বিলম্ব হইল না।

আমার অনাদর ও উপেক্ষা যে তাহার হৃদয়ে বেদনা দেয় নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। ষ্টেশন-মাষ্টারের মেয়ে যে আমার পছন্দ নয়, এ কথা সে জানিত। আমার সঙ্গে সে গল্প করিত বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়-দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে নাই। একটা সঙ্কোচভাব, একটা আশঙ্কা সর্ব্বদাই তাহাকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখিত। ট্রেন-সম্পর্কীয় কোন গল্প সে এক দিনের জন্যও আমার নিকট করে নাই। সে বুদ্ধিমতী, সন্দেহ নাই।

আমি অলক্ষ্যে লক্ষ্য করিতাম, ট্রেনের শব্দ শুনিলেই সে জানালার নিকট ছুটিয়া

দেখিতে যাইত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ট্রেন অদৃশ্য হইত, ততক্ষণ সে একদৃষ্টে চলন্ত গাড়ীগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত। ট্রেনের নেশা যে তাহার এখনও কাটে নাই, তাহা আমার অগোচর ছিল না, তবে আমার সমক্ষে সে আপনাকে সম্পূর্ণ সংযত রাখিত।

সেই নির্জ্জন নিরানন্দ স্থানে একজন সাথী পাইয়া, যত্ন করিবার একজন লোক পাইয়া, আমার মনেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইল। দোষগুণ লইয়াই মানুষ। দোষ দেখিলেই খড়্গ-হস্ত হওয়া বুদ্ধিহীনের কাজ। অনেক ত্রুটি, অনেক দোষ ক্ষমা করিয়া না লইলে সংসার চলে না।

ষ্টেশন-মাষ্টারের মেয়ে যে কোন দিন আমার মন আকর্ষণ করিতে পারিবে না ভাবিয়াছিলাম, সে বদ্ধমূল ধারণাও শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। সেই মেয়ের মধ্যে এমন শক্তি নিহিত ছিল অথবা আমার মনের এমনি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল যে, চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, সেও তেমনি আমার হৃদয় আকর্ষণ করিতে লাগিল।

এমন করিয়া কিছুদিন কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন আমার মনে হইল, রাত্রি ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ষ্টেশনে আমার কোন কাজ থাকে না, সময়টা কোন মতেই যেন কাটিতে চায় না। বাড়ী ফিরিবারও যো নাই। তখন আমার ডিউটি—কোন্ সময় কোন্ কাজ আসিয়া পড়ে, স্থিরতা নাই। নিরুপমাকে ষ্টেশনে আনিতে পারিলেই সব গোল চুকিয়া যায়। তাহাকেও একলা থাকিতে হয় না—আমারও একজন সঙ্গী হয়। বিশেষতঃ ষ্টেশনে সে সময়ে কুলীরা ছাড়া আর কেহ থাকে না।

পরদিনই নিরুপমার নিকট এই প্রস্তাব করিলাম। সে ত কোন মতেই তাহাতে সম্মত হয় না, "মেয়েরা ষ্টেশনে যাবে কি? লোকে দেখিলে বলিবে কি?"

আমিও নাছোড়বান্দা। বলিলাম, "আচ্ছা, তুমি বুঝি কখন ষ্টেশনে যাও নাই? আমি বুঝি জানি না?" "যাব না কেন? ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে প্রায়ই ষ্টেশনে যেতুম্।" "আর এখন বুঝি বরের সঙ্গে যেতে পার না? আচ্ছা—তোমার মা কি কখনও ষ্টেশনে যেতেন না?"

"যাবেন না কেন? বাবা মাঝে মাঝে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন।" "তবে—আর ত তোমার কোন আপত্তি শুনছি না।" "সকলে কি সব পছন্দ করে?" কথাটা যে আমাকে ঘা' দিয়া বলা হইল, সেটা বেশ বোঝা গেল। আমি না রাগিয়া বলিলাম, "দেখ তুমি যদি আমার সঙ্গে ষ্টেশনে না এস, তা হলে ৮টার পর আমি এখানে চলিয়া আসিব। তাতে যদি কাজের ক্ষতি হয় ত তুমি দায়ী।"

অগত্যা নিরুপমাকে সম্মত হইতে হইল। প্রথম কদিন সে লজ্জায় বিশেষ কোন কথা কহে নাই—আমিও বেশী পীড়াপীড়ি করি নাই।

একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, বল দেখি, এ ঘণ্টাটা কেন বাজ্‌ল ?" সে বলিল "তা বুঝি জানি নি। মেল ষ্টেশন ছেড়েছে।"

দুই একটা প্রশ্নের উত্তরে বুঝিতে পারিলাম যে, ষ্টেশনের নাড়ী-নক্ষত্র সে সবই জানে। কোন্ ঘণ্টা লাইন-ক্লিয়ারের, কোন্ ঘণ্টা যাত্রীদের টিকিট লইবার, ট্রেন নিকটস্থ হইলে কোন্ ঘণ্টা বাজে, এ সব তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। তাহাকে যে আমি নূতন কিছু দেখাইব বা শিখাইব, আমার এমন ক্ষমতা ছিল না।

একদিন নিরুপমাকে বলিলাম, "তুমিত রোজই এখানে আস্‌চ, টেলিগ্রাফের সংকেতগুলি কেন শিখে ফেল না। চেষ্টা করিলে তুমি এক মাসের মধ্যেই সব শিখে ফেল্‌তে পারবে ?"

"কেন গো, এত ঠাট্টা করচ কেন ? মেয়েরা মুর্খ তা সবাই জানে।"

"আচ্ছা—এক মাসের মধ্যে যদি তোমায় শিখিয়ে দিতে পারি।"

"যাও—তোমায় আর মিছে বক্‌তে হবে না।"

কিন্তু আমি বুঝিলাম 'তাহার পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ'। সে টেলিগ্রাফের তারের নিকট যেরূপ উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, প্রতি শব্দ যেরূপ ধীর-ভাবে লক্ষ্য করে, তাহাতে তাহার সংকেতগুলি শিখিবার যে বিশেষ ইচ্ছা আছে, সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় ছিল না। সুতরাং আমার শিখাইবার আগ্রহ যত প্রবল হইল, তাহার শিখিবার আপত্তি ততই কমিয়া আসিতে লাগিল।

এক সপ্তাহের মধ্যেই সে রীতিমত শিখিতে লাগিল। ইংরাজিতে তাহার বিদ্যা রয়েল রিডার পর্য্যন্ত, সুতরাং সব কথা সে বুঝিতে পারিত না। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই সে কাজ-চলা সংকেতগুলি এক রকম শিখিয়া ফেলিল।

সহসা একদিন রাত্রিতে আমি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলাম। নিকটে কোন ডাক্তার ছিল না। দুই ক্রোশ দূর হইতে নিবারণ বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তাঁহার ঔষধ খাইতে লাগিলাম। কিন্তু জ্বরের কোন উপশম দেখা গেল না। ডাক্তার বাবু বলিলেন, 'এ রেমিটেণ্ট ফিবার—৪১ দিনের কমে ভাল হইবে না'।

বৃদ্ধ ষ্টেশন-মাষ্টারটী আমার অনেক উপকার করিলেন। এক মাস ধরিয়া তিনি আমার কাজ করিয়া দিলেন। কিন্তু তখনও উপশমের কোন লক্ষণ না দেখিয়া অগত্যা তিনি আমার ছুটীর আবেদন-পত্রে আমার স্বপক্ষে খুব ভাল করিয়া লিখিয়া সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দুই মাসের ছুটী মঞ্জুর হইয়া আসিল।

৪১ দিন পরে আমার জ্বর ছাড়িল বটে, কিন্তু তাহার ধাক্কা সাম্‌লাইতে আমার আরও অনেক দিন লাগিল। দুই মাস পরে যখন আমার ছুটী ফুরাইল, তখনও দুই পা হাঁটিলেই আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম। আমার দুর্ব্বলতা তখনও যায় নাই।

দু'দিন নাইট্ ডিউটী করিতে না করিতেই পুনরায় আমার জ্বর আসিল। বেগতিক দেখিয়া আমি আবার ছুটীর দরখাস্ত করিলাম।

এক সপ্তাহের মধ্যেই উত্তর আসিল, "এখন লোকাভাব, ছুটী দেওয়া যাইতে পারে না"। ষ্টেশনমাষ্টার বাবু দয়া করিয়া কয়েকদিন আমার ডিউটী করিয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার কোলের ছেলেটীর বসন্ত হইল। তখন তাঁহার আর অবসর রহিল না। এমন কি তাঁহাকেও ছুটীর জন্য দরখাস্ত করিতে হইল।

দৃঢ় সংকল্প করিয়া আমি কাজে লাগিয়া গেলাম। অন্নের সংস্থান নাই—কাজ আমাকে করিতেই হইবে। মনের বলে আমি অসুখকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলাম।

কিন্তু সাত দিন কাজ করিয়া পুনরায় জ্বরাক্রান্ত হইলাম। শরীর সাহেবকেও খাতির করে না, মানুষের অবস্থাও বুঝে না। ডাক্তার বলিলেন,"জ্বর সামান্য, দুর্ব্বল শরীরে রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি অত্যাচারের জন্যই জ্বর হইয়াছে, সম্পূর্ণ বিশ্রাম পাইলেই জ্বর ছাড়িয়া যাইবে"।

তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি ঔষধ দিলেন, কিন্তু বলিয়া গেলেন "কার্য্যে ইস্তফা দেওয়া ব্যতীত আপনার আর উপায়ান্তর নাই"। অসুখের নিকট পারাপার নাই।

আমি অকূল পাথারে পড়িলাম। পরিবার লইয়া কাহার নিকট দাঁড়াইব—কাহার সাহায্য ভিক্ষা করিব? আমি নানা দুশ্চিন্তায় কাতর হইলাম।

আমাকে বিষণ্ণ দেখিয়া নিরুপমা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার বাবু আজ কি বল্লেন?"

"ডাক্তার বাবু কাজ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু তাহ'লে খাব কি?"

নিরুপমা জানিত যে, পরের সাহায্য লইতে আমার একান্ত অনিচ্ছা। তাহার পিতা অনায়াসেই আমাদিগকে আশ্রয় দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে আমি যে একান্তই অনিচ্ছুক, এ কথা তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

নিরুপমার নিকট আমি কোনও দিন কোনও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি নাই। 'স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী' বলিয়াই আমার বিশ্বাস ছিল। মূর্খ মেয়েরা যে পুরুষদের পরামর্শ দিতে পারে ইহা আমি বিশ্বাস করিতাম না। বুদ্ধিমতী নিরুপমাও গায় পড়িয়া কখন কোন পরামর্শ দিতে আসে নাই।

আজ বিপদে পড়িয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,'এখন কি করা যায় বল দেখি?'

আমাকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া নিরুপমা বলিল, "দেখ,একটা কাজ কর্‌লে হয় না? তুমি আমাকে রাত্রিতে ষ্টেশনে লইয়া যাও ত। আমি তোমার অনেক সাহায্য করিতে পারিব।"

বটেই ত, এ কথাটা আমার মনে হয় নাই।

নিরুপমা ত ষ্টেশনের কাজ আমা অপেক্ষা কোন অংশে কম জানে না।

টেলিগ্রাফের সংকেতগুলিও সে এক রকম শিখিয়া লইয়াছে। আমার সব কাজই সে বেশ চালাইতে পারিবে।

কুলীরা সকলেই আমার অনুগত। তাহাদের শিখাইয়া দিলাম যে, এ ব্যাপার তাহারা যেন কাহারও কাছে প্রকাশ না করে। যাত্রীদিগকে টিকিট-ঘরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলাম। টিকিট ঘরের পাশেই একটা ছোট মালের গুদাম ছিল। প্রথম দুইটা দিন নিরুপমাকে সেইখানে লুকাইয়া রাখিলাম।

কিন্তু নিরুপমা যখন দেখিল টিকিট কাটিতে আমার হাত কাঁপিতেছে, তখন সে আমাকে জোর করিয়া ইজি চেয়ারে বসাইয়া দিয়া নিজেই টিকিট কাটিয়া দিতে লাগিল। পাছে যাত্রীরা জানিতে পারে সেই ভয়ে সে পূর্ব্বেই হাতের গহনা খুলিয়া রাখিয়াছিল।

যখন ট্রেন ছাড়ার তার আসে, তখন সে আমাকে ইসারা করে। আমি ইজি-চেয়ারে শুইয়া কুলীদের ঘণ্টা দিতে বলি। গার্ডেরা মধ্যে মধ্যে আমার সহিত পরামর্শ করিতে আসে। এইজন্য প্যাসেঞ্জার ট্রেণ আসিলে আমি নিরুপমাকে মাল-গুদামে রাখিয়া টিকিট ঘরের দরজা খুলিয়া দিই।

মেলের সময় কোন গোলমাল নাই। নিরুপমা প্রায় সব কাজই করে। সেই লাইন ক্লিয়ার দেয়, সেই কুলীদের ঘণ্টা দিতে বলে, সেই ষ্টেশনের আলোগুলি জ্বালাইয়া দেয়।

এইরূপে কোন প্রকারে এক মাস কাটিয়া গেল। বিশ্রাম লইয়া আমি সবল হইতে লাগিলাম। জ্বর আর দেখা দিল না।

আমি সবল হইয়া উঠিলাম। কিন্তু নিরুপমা আর আমাকে কোন কাজ করিতে দেয় না। টিকিট কাটিতে গেলে বলে, "বাড়াবাড়ি করিও না, আবার জ্বর আসিবে।" আমি তাহার সঙ্গে তর্কে পারিতাম না।

এক দিন ডাউন্ প্যাসেঞ্জার সবে মাত্র চলিয়া গিয়াছে। একটা টুলে বসিয়া একাগ্রমনে নিরুপমা টিকিট বিক্রয়ের হিসাব করিতেছিল। আমি ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধ-শয়ান হইয়া তাহাকে দেখিতেছিলাম। সে হিসাবে এমনি তন্ময় হইয়াছিল যে, তাহার অবগুণ্ঠন লোল কবরীচ্যুত হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা ছিল না। তাহার সেই কুঞ্চিত ক্ষুদ্র ললাটে বিচ্ছিন্ন কুন্তলগুলি খেলিয়া বেড়াইতেছে। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে বালিকার সুদীর্ঘপক্ষবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু কালিমায় ভরিয়া গিয়াছে।

আমি মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে-ছিলাম। তাহার নিঃস্বার্থ প্রেম, অপরিসীম যত্ন, অশ্রান্ত অধ্যবসায়ই আমাকে এ যাত্রা বাঁচাইয়াছিল। কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল।

সহসা টেলিগ্রাফের তারগুলি খট্‌খট্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। তারগুলি নড়িতেই নিরুপমা উঠিল। অসময়ে তারের শব্দ শুনিয়া আমিও উঠিয়া গেলাম।

হেড্ অফিস্ হইতে তার আসিতেছে যে, ষ্টেশন-মাষ্টারের ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে। আমাকেই তাঁহার কাজ করিতে হইবে। আমার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া সাহেব আমার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

নিরুপমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েচে? হেড্ আফিস্ থেকে হঠাৎ টেলিগ্রাম এল কেন? কোন স্থানে কলিসন্ হয়েছেনাকি?"

হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া নিরুপমাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "হেড্-আফিস্ থেকে তার এসেছে যে, বুড় ষ্টেশনমাষ্টারের ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে, আমাকে তাঁহার কাজ করিতে হইবে। আমার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া সাহেব আমার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।"

আনন্দিত হইয়া নিরুপমা বলিল, "সত্যি?" আমি বলিলাম "হাঁ, সত্যি"।

নিরুপমাকে এবার কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "নিরুপমা, আমার এ উন্নতি কেবল তোমারি জন্যে? তোমার নিরুপমা নাম তুমি সার্থক করিয়াছ। দিদিরা মিথ্যা কথা বলিতেন না।"

নিরুপমা আমার হাতখানি ধরিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "তা'হ'লে ষ্টেশনমাষ্টারের মেয়ে তোমার নিতান্ত অপচ্ছন্দ নয়?"

আমি নিরুপমাকে আদর করিয়া বলিলাম, "দেখ, ফের এ সব কথা বলিলে আমি তোমার সহিত ঝগড়া করিব।"

এতদিনে আমাদের মনের মিল হইল।

শ্রীযতীশচন্দ্র বসু, এম, এ।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

১৫ বৎসর বয়সে লিখিত রোমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

২। রোমানদিগের সাধারণতন্ত্র।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রুটস ও কলেটাইনস।

১। রোমের শেষ রাজা টার্কুইনস সুপার্ব্বস সপরিবারে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইলে দুই জন কন্সল বা অধ্যক্ষ রোমের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

২। রোমনগর স্থাপনের ২৪৪ বৎসর পরে এবং খ্রীষ্টের জন্মের ৫১০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা শাসন করিতে আরম্ভ করেন।

৩। কন্সলেরা রাজা ছিলেন না, তাঁহারা শাসনকর্ত্তা মাত্র। তাঁহাদিগের হস্তে সমুদায় রাজকীয় ক্ষমতা সমর্পিত হইত, কিন্তু অধিক দিন হস্তে ক্ষমতা থাকিলে পাছে তাঁহারা অত্যাচারী হইয়া উঠেন, এইজন্য এক বৎসর কাল মাত্র তাঁহাদিগের শাসনের সীমা নিরূপিত ছিল।

৪। ব্রুটস ও কলেটাইনস এই দুই জন প্রথম কন্সল হইলেন। কিন্তু টার্কুইন নাম রোমের সর্ব্বত্র এরূপ ঘৃণাস্পদ হইয়াছিল যে, কলেটাইনস্ ঐ

নাম গ্রহণ করাতে পদচ্যুত হইলেন এবং ভেলেরিয়স পর্শিকোলা তাঁহার পদে নিযুক্ত হইলেন।

৫। ব্রুটস অতি মহৎ লোক ছিলেন। টার্কুইন তাঁহার পিতা জুলিয়সের, তাঁহার ভ্রাতার এবং অন্যান্য সেনেটরদিগের প্রাণ সংহার করাতে তিনি ঐ নিষ্ঠুর অত্যাচারীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সকল লোকের নিকট আপনাকে বাতুলের ন্যায় দেখাইতেন। কিন্তু এই সময়ই তাঁহার পরিচয় দিবার সুসময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া আত্মভাব ব্যক্ত করিলেন।

৬। স্বদেশের প্রতি তাঁহার এরূপ অসামান্য অনুরাগ ছিল যে, সাধারণের হিতার্থে তিনি আপনার স্বাভাবিক স্নেহ-বন্ধনও ছেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল বলিয়া তিনি পিতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া অম্লানবদনে তাহাদিগের শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন এবং স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহা করাইলেন।

৭। টার্কুইন সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত হইবার প্রস্তাব করিয়া রোমে আপনার প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, তাহা দ্বারাই ঐ চক্রান্তটী ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহা সফল হইল না।

৮। অতঃপর টার্কুইন অন্যান্য প্রতিবেশী রাজাদিগের সাহায্য লইয়া বারম্বার রোম আক্রমণ করেন। তন্মধ্যে এক যুদ্ধে টার্কুইনসের পুত্র আর্ণসের হস্তে ব্রুটসের এবং ব্রুটসের হস্তে আর্ণসের মৃত্যু হয়। এই যুদ্ধে ভেলারস্ রোমসেনাধ্যক্ষ ছিলেন এবং বিজেন্টি জাতি টার্কুইনের সহায় হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাধারণতন্ত্রকালে রোমানদিগের যুদ্ধের বিবরণ।

রাজ্যতন্ত্র বিলুপ্ত হইয়া সাধারণতন্ত্র আরম্ভ হইলেই রোমানেরা প্রতিবাসী জাতিদিগের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধারম্ভ করিল এবং এক দেশের পর অন্য দেশ, তৎপরে তৃতীয় দেশ, এইরূপে ক্রমশঃ নূতন নূতন দেশ সকল জয় করিয়া রোম-রাজ্যের সীমা বিস্তার করিতে লাগিল। তাহাদের জয়-পিপাসা সমস্ত ইটালীতে তৃপ্ত হইল না, প্রত্যুত ক্রমশঃ প্রবল হইয়া দক্ষিণে ভূমধ্যস্থ সাগর পার হইয়া আফ্রিকার উপর পড়িল, পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগরে গিয়া নিবৃত্ত হইল, উত্তরে ডানিউব ও রাইন নদী এবং পূর্ব্বে ইউফ্রেটিস নদী পর্য্যন্ত অধিকার করিল।

২। এই সময়ের মধ্যে রোমানদিগের ১৯টী প্রধান যুদ্ধ হয়, পশ্চাৎ সংখ্যাক্রমে তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। ১ ইট্রুরীয়, ২ লাটিন, ৩ ভলসীয়, ৪ বিজেণ্টিয়, ৫ গলিক, ৬ দ্বিতীয় লাটিন, ৭ সামনাইট, ৮ টরেন্টিয়, ৯ প্রথম পিউনিক, ১০ দ্বিতীয় পিউনিক, ১১ আণ্টিওকসের সহিত, ১২ মাসিডোনীয়, ১৩ তৃতীয় পিউনিক, ১৪ করিন্থীয়, ১৫ পর্টুগাল, ১৬ নিউমানসীয়, ১৭ শ্লেভ বা দাসদিগের সহিত, ১৮

জুগার্থার সহিত, ১৯ মিথ্রিডেটিসের সহিত যুদ্ধ (ক)।

৩। এতদ্ভিন্ন মেরিয়স ও সিলা, সিজর, পম্পে এবং অন্যান্য রোমীয় সেনাপতি-দিগের মধ্যে অনেক বিবাদ, কলহ ও যুদ্ধ হয়। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে তাহার বিশেষ বর্ণনা করা যাইতে পারে না।

৪। যাহা হউক, রোমানেরা কেবল রাজ্যবৃদ্ধি করিবার জন্যই সকল যুদ্ধ করে নাই। অনেক স্থলে স্বদেশরক্ষার্থ এবং আশ্রিত ও মিত্ররাজ্যের সাহায্যার্থও সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

(ক) ১, ইটুরিয়া দেশ টাইবার নদীর পশ্চিম। ২ রোমের দক্ষিণস্থ লোকেরা লাটিন। ৩ টস্কানীর লোক জঙ্গলীয় জাতি। ৪ বিজেণ্টিয়া ভিয়াই নামে টস্কানীর এক প্রাচীন নগরের লোক। ৫ ফ্রান্সের প্রাচীন নাম গল। ৬ সামনিয়ম, বর্ত্তমান নেপল্‌স্। তথাকার লোকেরা সামনাইট। ৮ টরেণ্টিয়, ইটালীর টরেণ্টিয়মের লোক। ৯ আফ্রিকায় কার্থেজ নগরের সহিত রোমের যে যুদ্ধ হয়, তাহাকে পিউনিক যুদ্ধ বলে। ১১ আণ্টিওকস্ আসিয়ায় তুরস্কের অন্তর্গত সিরিয়ার রাজা ছিলেন। ১২ ম্যাসিডন, প্রাচীন গ্রীসের এক অংশ, বর্ত্তমান ইউরোপীয় তুরস্কের অন্তর্গত। ১৩ করিন্থ গ্রীসের এক প্রাচীন নগর। ১৫ পর্টুগাল বা প্রাচীন লুসিটনীয়া, স্পেনদেশের পশ্চিম। ১৬ নিউমানশিয়া স্পেনের ওল্ডকাসল প্রদেশের এক নগর। ১৭ সিসিলির লোকদিগকে রোমকেরা শ্লেভ অর্থাৎ ক্রীতদাস কহিত। ১৮ জুগার্থা আফ্রিকার অন্তঃপাতী নিউমিডিয়ার রাজা, এই দেশের মধ্যে বর্ত্তমান আলজিয়ার্স প্রভৃতি দেশ। ১৯ মিথ্রিডেটিশ, আসিয়ায় তুরস্কের অন্তর্গত পোণ্টসের রাজা ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ইটুরীয় যুদ্ধ।

১। রাজাতন্ত্র বিলুপ্ত হইলে (খৃঃ পূঃ ৫০৮) ইটুরীয়দিগের সহিত রোমানদিগের প্রথম যুদ্ধ হয়।

২। ইটুরিয়াধিপতি পোর্সেনা টার্কুইনের স্বপক্ষ হইয়া বলশালী সেনানীগণের সহিত রোমনগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হোরেসিও কক্লিস ও স্সিউরিয়স স্কেভোলা এই দুই জন রোমান বীরপুরুষ এরূপ অসম সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন যে, তাহাতে তিনি চমৎকৃত ও ভয়াক্রান্ত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, রোমান-দিগকে তিনি জয় করিতে পারিবেন না, তৎক্ষণাৎ টার্কুইনসের পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

লাটিনদিগের সহিত যুদ্ধ।

১। পোর্সেনা পক্ষত্যাগ করিলে পর টার্কুইনের জামাতা মানলিয়স্ লাটিন-দিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিল।

২। রিজিলস হ্রদের নিকট (খৃঃ পূঃ ৫০১) এক ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং রোমানেরা এই যুদ্ধে জয়পতাকা উড্ডীয়মান করেন।

৩। এই যুদ্ধে মানলিয়স্ লাটিনদিগের এবং আলস পষ্টুলস রোমানদিগের সেনাপতি ছিলেন।

৪। মানলিয়স হত হয় এবং তাহার সহিত ৩৪ সহস্র লাটিন সমরশায়ী হয়।

রোমানদিগের সহস্র সৈন্য মাত্র ক্ষয় হয়। মানলিয়সের মৃত্যু হইলে টাকুইন পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় এককালে জলাঞ্জলি দিলেন।

একাধারে সব।

স্নেহে তুমি পিতা পাতা,
মমতায় যেন মাতা,
ভ্রাতা ও ভগিনী সম ভালবাসা-ভরা।
আত্মীয়গণের মত
শুভাকাঙ্ক্ষী অবিরত,
সুধাময় শিশুসম শুভ্র মনোহরা!
একপ্রাণতায় পতি,
মরণে অমৃত অতি,
দ্যুলোকে সুগতি তুমি ভবে বরাভয়।
পাপে তাপে আহা,—'হরি',
শোকেতে তরণী মরি,
বিপদের ঘোর দুঃখে বড় দয়াময়।
সেবায় সতত দাস,
বিশ্রামের নাহি আশ,
খাটি মরি বার মাস চির-ক্লান্তিহীন,
জীবনের রাজকাজে
রাজ রাজ্যেশ্বরসাজে,
সত্য ন্যায়বানরূপে চির রাত্রিদিন।
পালনেতে ধাত্রী মাতা,
দূর করি মর্ম্মব্যথা,
সখা সম আহা মনোরঞ্জনে নিপুণ,
পদে পদে করি দোষ,
তবু নাহি কর রোষ,
ক্ষমাতে মা বসুন্ধরা সগুণ নির্গুণ।
বিশ্বপ্রেমিকের মত
অপ্রেমেও হিতরত,
সদা নিরমল প্রেম নিষ্কাম সুন্দর।
না পেলেও প্রতিদান,
(নাহি মান অভিমান)
করে যাও আত্মদান।
বিরাট, মহান্, ভূমা, পুরুষ অক্ষর।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি,
হে মম পরম গতি,
প্রতিটি পলকে তুমি বিশ্ব ভুবনের।
ত্রিলোকের পালয়িতা,
ভকতের পরিত্রাতা,
ওগো, সে সময়ে তুমি আমারও প্রাণের।
জান এ অন্তর যথা,
বিশ্বের ও ভারতী তথা,
নিমেষে নিমেষে মোর রহি হিয়ামাঝ।
নিখিল বন্দনা স্তুতি,
অধমের ও প্রেম প্রীতি
গ্রহণ করিছ এক অদ্বিতীয় রাজ।
বিশ্বের ধারি না ধার,
তুমি মোর প্রাণাধার,
তুমি মোর জ্ঞানদাতা, তুমি চিন্তামণি।
তুমি প্রাণ, তুমি মন,
জীবন যুড়োন ধন,
সর্ব্বস্ব রতন বলি তোমারেই গণি।
তোমারে পাইলে আমি
থাকি নাথ, দিন যামী
কিবা সুখ শান্তি স্বর্গে কিছু নাহি চাই।

একাধারে সব সখা,
লভি গো তোমাতে একা,—
হেন তোমা বঞ্চি কেন এতদিন রই।
রাখিলে গো দূরে দূরে,
তপত দুঃখের পুরে,
সুখ সুখ করে কেন ঘুরালে আমায় ?
ওয়েসিস পরিহরি,
কেন দেব হরি হরি,
মরুভূমে কাঁদাইলে মৃগতৃষ্ণিকায় ?
দিতে চির সুপ্রভাত
বুঝি গো রাখিলে নাথ,
দুরন্ত আঁধারভরা জীবনে যামিনী ;
আজ সব অবসানে,
তিমিরের তিরোধানে,
পূরবে ভাতিল ওই দীপ্ত দিনমণি।

— শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

বিশ্বসেবা ব্রতে স্ত্রীলোকের সহকারিতা।

এ সংসার দুঃখময়। প্রকৃত সুখ অতি অল্প লোকের ভাগ্যে অতি অল্প সময়ই ঘটে। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক, ত্রিবিধ দুঃখে সংসার জর্জ্জরিত। জরা, ব্যাধি, শোক, তাপ, দরিদ্রতা প্রভৃতি অশেষবিধ যন্ত্রণানলে মানব প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইতেছে। সুখের মরীচিকায় প্রলুব্ধ হইয়া সংসারমরুভূমে প্রাণান্ত যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে নরনারী অবিরাম হাহাকার করিতেছে। অথচ সংসার এমনই মোহমন্ত্রে মুগ্ধ যে, পরস্পরের আর্ত্তনাদ পরস্পরে শুনিতে পায় না। যাহারা ধনের গরিমায় প্রমত্ত, দরিদ্রের হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করে না। যাহারা জ্ঞানালোকে জ্যোতিষ্মান্, তাহারা অজ্ঞানান্ধ ভ্রান্তিশীল জনসমাজের অনন্ত দুঃখেরদিকে ফিরিয়া চাহে না! অথচ ধনী ও জ্ঞানী কেহই ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না, সকলেই দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু মোহান্ধতা ও স্বার্থপরতার জন্য, সমদুঃখীর সহিত সহানুভূতি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

মরণশীল সংসারে বিস্মৃতি ভিন্ন আর কিছুতেই বোধ হয় সুখ নাই। আপনার প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হইলে, আত্মার বিবিধ দুর্গতির কথা স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিলে, সংসারলভ্য সুখরাশিতে তৃপ্তি হয় না। যে যেখানে সুখী আছে, সকলেই আত্মবিস্মৃত। জীবনের গভীর উদ্দেশ্য ও দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেলেই সংসারের অসার সুখে প্রাণ মগ্ন থাকিতে পারে। যাহারা নিজের অবস্থা ভাল করিয়া জানে না, তাহারা আত্মপ্রতারিত। তাহারা যে কৃপা-পাত্র, তাহাতে কি সন্দেহ আছে? একটা না একটা অসুখের কারণ প্রত্যেকেরই সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে। কাহারও দুশ্চিকিৎস্য

ব্যাধি, কাহারও হৃদয়ভেদী শোক, কাহারও পাপের জ্বালা, কেহ দারিদ্র্যের কশাঘাতে অস্থির, কঠোর নৈরাশ্যে কেহ বা ভগ্নহৃদয়, সংসারের নির্ম্মমতায় কেহ বা মর্ম্মাহত। কাহার অশ্রুবারি নিবারণ করিবে? এক দিকে থামাইতে যাইয়া আর এক দিকে ক্রন্দনের রোল শুনিতে পাইবে। একটা সামাজিক অনিষ্ট দূর করিতে যাইয়া আর একটা নূতন অনিষ্ট ঘরে আনিতে হইবে। জনসমাজ প্রায় সকল দেশেই বিবিধ দুর্নীতি ও দুরাচারে কলুষিত, বাহিরের সভ্যতার আবরণ উন্মোচন করিলে অন্তর্বাহী পাপস্রোত অনু-ভব করিতে পারা যায়। কত স্থানে কত প্রকার দাসত্ব, কত প্রকার অত্যাচার, রমণী ও নীচ জাতিগণের উপর কত নিগ্রহ, কত দেশব্যাপী মারাত্মক পীড়ার তীব্র উৎপাত রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। একবার নিবিষ্টচিত্তে এ সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

সাধ করিয়া বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করেন নাই। রাজকুমার যে উদাসীন হইয়াছিলেন, তাহা অতীব সঙ্গত। তাঁহার স্বভাবতঃ সরল ও পবিত্র হৃদয় এই শোক-তাপময় সংসারের যাতনার দুই একটী চিত্র দেখিয়াই গলিয়া গিয়াছিল। তিনি চিন্তা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়াছিলেন। পাপী তাপী মানবের ভবজ্বালা নিবারণ করিয়া তাহাকে মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশ হইতে রক্ষা করা তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়াছিল। তিনি নির্ব্বাণ মুক্তির পথ জানিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। বিশ্বসেবাব্রতে তিনি জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন।

যাহার হৃদয় অবিকৃত আছে, সেই কাঁদিতে পারে। সংসারের বিবিধ প্রকার কুটিল ভাবের মধ্যে না পড়িলে অপরের কষ্ট দেখিয়া আমরা কষ্ট না পাইয়া থাকিতে পারি না। মানব-প্রকৃতিতে পরার্থপরতা একটী স্বাভাবিক বৃত্তি। সমবেদনা অনুভব করিবার শক্তি আমাদের প্রকৃতিজাত, অভিজ্ঞতা-লব্ধ নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। নিজের কোন প্রকার কষ্ট হইলে, তাহা দূর করিতে চেষ্টা করা যেমন স্বাভাবিক, অপরের অশ্রুজলও দীর্ঘকাল দেখিতে ও শুনিতে পাইলে তাহার যথাসাধ্য প্রতিবিধান করিবার উদ্যম তেমনিই সহজ ও স্বাভাবিক। সেইরূপ আবার অপরের দুঃখে নির্ব্বিকার হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকাও প্রকৃতির স্বভাববিরুদ্ধ। এই উপজীবিকা বৃত্তির উপরেই পরোপ-কার ও সেবার ভিত্তি।

হৃদয়ের নিকট বিচার ও বিবেচনা নাই। স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ ফলাফল গণনা হৃদয়তার লক্ষণ নহে। দয়া সহজ ও সরল, বুদ্ধির দ্বারা তর্ক করিয়া সদয় হওয়া যায় না। হৃদয় দেশ, কাল, পাত্র বিচার করিতে জানে না, যেখানে যখনই দুঃখ যন্ত্রণা দেখে, সেখানে তখনই তাহার যথাসাধ্য উপশম করিতে চেষ্টা করে।

স্বার্থপরতা অনেক প্রকার আছে। স্বার্থপরতা সঙ্কীর্ণও হইতে পারে, বিস্তির্ণও হইতে পারে। আত্মীয় পরিবার ও প্রতিবেশিগণের মধ্যেই আমাদের প্রীতি আবদ্ধ থাকে। মনুষ্য বড় দুর্ব্বল, আপনার পরিবার, আপনার আত্মীয় স্বজন সে বেশ বুঝিতে পারে। জগতের ও জীবের কল্যাণকে স্বার্থের ন্যায় ভালবাসা সাধারণ লোকের চরিত্রে ঘটিয়া উঠে না। যাঁহার আজীবন শিক্ষা উদার, যাঁহার জ্ঞান উন্নত, যিনি ধর্ম্মবলে বলী, তিনিই বিশ্বপ্রেমে মত্ত হইতে পারেন। বিশ্ব-সেবাব্রতের জন্য জীবন উৎসর্গ করা কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? যাঁহার সে স্বার্থত্যাগ, সে আত্মোৎসর্গ আছে, তিনিই ধন্য।

পৃথিবীতে যত সাধু ব্রত আছে, বিশ্বসেবা-ব্রত সকলের শীর্ষস্থানীয়। পরার্থপরতার মহিমা বলিয়া বুঝান যায় না, অনুভব করিয়া বুঝিতে হয়। প্রীতি সেবার জননী। প্রীতি যদি সর্ব্বভূতে বিস্তৃত না হয়, তাহা হইলে সেবাও সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে। হৃদয়হীন সেবাশুশ্রূষা সংসারে বিরল নহে, কিন্তু তাহাতে আত্মার কল্যাণ না হইয়া বরং অধোগতিই হয়। সার্ব্বভৌমিক প্রেম না জন্মিলে বিশ্বসেবা কল্পনার কথা মাত্র। দেশ, কাল ও জাতিগত কুসংস্কার এবং সংকীর্ণতা ছাড়াইয়া, সমস্ত জগতে প্রেম পরিব্যাপ্ত হওয়া বড় সহজ নহে। আমাদের প্রীতি-নদীর দুই তীর যেন প্রকাণ্ড, উচ্চ এবং পাষাণময়, কত প্রবল স্রোত ও উচ্ছ্বাস হইলে তবে সে বাঁধ ছাপাইয়া তাহার জল বিশ্বপ্রান্তরে ব্যাপিয়া পড়িবে, তাহা কে বলিতে পারে? তেমন প্রেমের বন্যা সকল নদীতে হয় না।

সার্ব্বভৌমিক প্রেম লাভ করিতে হইলে জ্ঞান বিস্তৃত এবং ধারণাশক্তি প্রখর হওয়া চাই। যে জগতের সংবাদ রাখে না, বা নরনারীর বিবিধ দুঃখ দুর্গতির কথা যাহার হৃদয়ে চিরকালের জন্য দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া না যায়, সমস্ত মানবসমাজের সুখ দুঃখের সহিত তাহার অতি নির্জ্জীব সহানুভূতি থাকিবে। সাধারণ মানব-জাতির একটা ধারণা করিতে যাইলেও মনের অনেক প্রশস্ততার প্রয়োজন। আর, ধর্ম্মের জীবন্ত শক্তিতে অনুপ্রাণিত না হইলে এরূপ সর্ব্বজনীন প্রীতির উদ্ভব হইতে পারে না। বিশ্বপতি অদ্বিতীয় বিধাতাকে পিতা বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারিলে 'সব মানুষ পরস্পর ভাই ভাই' এ জ্ঞান জন্মে না। সমুদ্রের জল হইতে বাষ্প উঠিয়া মেঘের রূপ ধারণ করে এবং বৃষ্টির বেশে পর্ব্বতে পতিত হয়। সেই বৃষ্টির জল নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া কত দেশ ভ্রমণ করিয়া পরিণামে আবার সেই সাগরে আসিয়া মিশাইয়া যায়। ঠিক এই প্রকারে মানব হৃদয়ের প্রীতি আগে ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের চরণে প্রণত ও কৃতার্থ হইয়া পরিশেষে মানবসমাজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সেই অনন্ত প্রস্রবণের সহিত আমাদের হৃদয়-নদীর যোগ না থাকিলে আমরা কখন

সমস্ত বিশ্বকে প্রেমসলিলে স্নিগ্ধ করিতে পারি না।

বিশ্বসেবাব্রতে সহস্র সহস্র বিঘ্ন, বাধা ও প্রতিকূলতা মস্তক তুলিয়া দণ্ডায়মান, তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে হইলে দুর্জ্জয় বিশ্বাস ও প্রাণপণ নির্ভরের প্রয়োজন। সত্য ও প্রেমের জয় হইবেই হইবে, এই বিশ্বাস দুর্ব্বল দেহেও বল সঞ্চার করিয়া দেয়।

রমণী অনেক বিষয়ে এই মহাব্রতপালনে সহকারিণী হইতে পারেন। তাঁহার হৃদয় দয়া মমতায় গঠিত। তিনি প্রীতিরূপিণী। প্রেমই তাঁহার প্রকৃতির প্রধান উপাদান। পুরুষ অপেক্ষা সকল দেশেই নারীর কোমলতা অধিক। দুর্ব্বল হইলেও স্ত্রীজাতি প্রেমবলে সবল। জননী, ভগিনী ও সহধর্ম্মিণীরূপে রমণীর স্নেহ মানব-জাতিকে অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মরুভূমিতে পান্থ-পাদপের গাত্রে আঘাত করিলেই যেমন স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ পানীয় জল বহির্গত হয়, তেমনি সংসারে নারীহৃদয় মানবের দুঃখ জ্বালার সংস্পর্শে দ্রবীভূত হইয়া যায়, এবং তাহা হইতে অমৃতময় প্রেমবারি নিঃসৃত হইয়া দগ্ধ জনসমাজকে পরিতৃপ্ত করে।

পরের দুঃখ কষ্ট দেখিলে রমণী অশ্রুধারা সম্বরণ করিতে পারেন না, সেই জন্য তিনি পরসেবায় জীবন সমর্পণ করিতে প্রস্তুত। পরের সেবাশুশ্রূষা করা রমণীরই যেন অধিকার বলিয়া বোধ হয়। সেবাশুশ্রূষায় হৃদয়ের যে কোমলতা, যে সহানুভূতি, যে ধৈর্য্য এবং যে স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন, তাহা নারীচরিত্রে বিশেষরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা দাসীর ন্যায় অহরহঃ সকলের সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের আর অন্য কাজ নাই। সেবার জন্যই যেন তাঁহাদের জীবন, তাহাই যেন তাঁহাদের প্রকৃতির একমাত্র অঙ্গ। স্নেহময়ী রমণী রোগীর শুশ্রূষা যেমন করিয়া করিতে পারেন, এমন আর কে পারে? তাঁহার সেবার কেমন এক সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আছে, তাহা বলা যায় না! তাঁহার দয়ার কি মোহিনী শক্তি আছে, তাহা যে উপকার পাইয়াছে, সেই জানে।

রমণীর সহিষ্ণুতা চিরপ্রসিদ্ধ। সংসারের গুরুতর কষ্টের ভার রমণী নিজেই বহন করেন। প্রেম যাঁহার হৃদয়ের শোণিত, তিনি সহিষ্ণু না হইয়া থাকিতে পারেন না। সংসারের দৈনিক জীবনে কত উত্তেজক কারণ প্রতিনিয়ত উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু গৃহিণীকে অতি অল্পই ক্রোধান্বিত হইতে দেখা যায় স্ত্রী-প্রকৃতি সাধারণতঃ স্নিগ্ধ, কোমলতা ও বিনয় তাহার ভূষণ। ক্রোধ এইরূপ সুকোমল প্রকৃতির বিরোধী।

স্বার্থত্যাগ স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ। পতি, পুত্র, আত্মীয় স্বজন, অতিথি, ও অভ্যাগত লোকের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করাই তাঁহারা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। রমণীর স্বার্থত্যাগ কল্পনার কথা নহে, জীবনের পরীক্ষিত বিষয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগস্বীকার ক্রমাগত

করিতে করিতেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়া থাকে। সে স্বার্থনাশের ইতিহাস কে স্মরণ রাখে? উহা আমাদের জীবনে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, এই জন্য বিস্ময় বা মনোযোগ আকর্ষণ করে না। পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর জন্য কত ত্যাগস্বীকার, কত পরিশ্রমই না করেন! জননীর ন্যায় স্বার্থত্যাগ এ পাপময় সংসারে আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? রোগ যন্ত্রণার সময় কে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অবিরাম শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকেন? সে অপার্থিব স্বার্থনাশ কেবল জননীতেই সম্ভব। কত অজ্ঞাত পরিবার আছে, যেখানে অনেক সময় এরূপ স্বর্গীয় স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইলে স্ত্রীচরিত্রের কতই না মহিমা বৃদ্ধি হয়। অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সমাজের গণনায় নিম্নশ্রেণীস্থ কত পরিবারের স্ত্রীলোকেরা প্রতিদিন নূতন নূতন দুঃখ, শোক ও দরিদ্রতার ভার অম্লান বদনে বহন করিতেছেন অথচ তাঁহাদের মুখে সন্তোষের হাসি! রমণী প্রিয়জনের জন্য পৃথিবীর সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারেন, তাঁহার এমন প্রকৃতি। সতী রমণীর সতীত্বের তেজ, সকল তেজের শীর্ষস্থানীয়। সেবাব্রতে নৈতিক বলই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এইরূপে দেখা যায় যে, বিশ্বসেবাব্রতে রমণী পুরুষের সহায় হইতে পারেন। এই ব্রতসাধনে স্ত্রীলোকের বিলক্ষণ সামর্থ্য আছে। কিন্তু এই মহাব্রত বালক বালিকার ক্রীড়ার বিষয় নহে। ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইলে জীবন উৎসর্গ করিতে হয়, সংসারের সকল মায়াপাশ ছিন্ন করিতে হয় ও ঐহিক সুখ সম্পদ, বিলাস বাসনা, সকলই বিসর্জ্জন দিতে হয়। নিজের জন্য কিছু রাখিলে চলে না। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিলে এই ব্রত সম্যক্‌রূপে উদ্‌যাপন করা যায় না। রমণী এই ব্রতে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে চিরকুমারী বা ব্রহ্মচারিণী হইতে হইবে। তাঁহার যে প্রীতি সাধারণতঃ ক্ষুদ্র পরিবারমধ্যে আবদ্ধ থাকিত, তাহা সমস্ত বিশ্বসংসারে পরিব্যাপ্ত করিতে হইবে। বিশ্বসংসারকে তিনি এত স্নেহ করিবেন যে, সেই স্নেহ যেন সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারে। গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, প্রফুল্লতার সহিত কুমারী বা ব্রহ্মচারিণী যখন পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করেন, তখন তাঁহার কি স্বর্গীয় শোভাই হয়! রমণী তখন দেবী হন। এইরূপ দুই এক জন দেবী যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সেই জাতি ধন্য হইয়া যায়।

সংসারের সুখরাশির প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া প্রাণের সমস্ত আগ্রহ ঈশ্বরপ্রেমে এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে নিয়োগ করিতে পারিলে, তবে বিশ্বসেবা সহজ হয়। যাহার হৃদয় কাঁদে, সে ত চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। এইজন্য হৃদয়ের সদ্ভাবগুলির বিশেষ চর্চ্চা রাখিতে হয়। নরনারী উদার উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত না

হইলে এই মহাব্রতের দায়িত্ব বুঝিতে পারিবেন না।

আমাদের দেশে এইরূপ মহানুভব রমণী অতি অল্পই আছেন, যাঁহার হৃদয় স্বজাতি বা অপর জাতির দুঃখ-দুর্গতি দেখিয়া কাঁদিতে শিখিয়াছে। অন্তঃপুরের সংকীর্ণতার মধ্যে আজীবন বদ্ধ থাকিয়া বহির্জগতের সংবাদ রাখা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধুনা উচ্চ শিক্ষার ফলে ভারতরমণীগণ সর্ব্বদা নানা প্রকার হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইতেছেন,তথাপি তাঁহারা এখনও সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। বিশ্বসেবার ভাব উন্মেষিত করিতে হইলে তাঁহাদের মধ্যে আরও বিদ্যা ও ধর্ম্মশিক্ষার বিশেষ প্রচার হওয়া আবশ্যক।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে নরনারী সমস্ত মানবজাতির সহিত সহানুভূতি করিতে এবং স্বাধীন ভাবে সকল বিষয়ের চিন্তা ও কার্য্য করিতে সমর্থ। এই কারণেই তাঁহারা এত উন্নত।

বিদেশীয় বিশ্বহিতৈষী নর নারীর কথা মনে হইলে হাউয়ার্ডের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মৃতিপথে উদিত হয়। তাঁহার নাম সভ্য জগতে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইউরোপীয় কারাসংস্কাররূপ মহৎ কার্য্যে তিনি জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। ভগিনী ডোরা ও কুমারী ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল্ রমণীজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহাঁরা দয়ার অবতার, এ কথা বলা যায়। ইহাঁদের নাম স্মরণ করিলে স্ত্রীজাতির উপর গভীর শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাঁহারা যেরূপ বিশ্বসেবাব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা অতি বিস্ময়কর। অবলার শক্তিতে যে পৃথিবীর কত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা তাঁহাদের জীবনে সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে সৈনিকপুরুষদিগের জীবনের দুরবস্থা পরিবর্ত্তন করায়, তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে সেবা শুশ্রূষায়, হাঁসপাতালের সেবিকা-দল প্রস্তুত করায়, স্বাস্থ্যের নিয়ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান সাধারণে প্রচার করায় এবং শ্রমজীবিগণের সাধারণ উন্নতি সাধনেই কুমারী নাইটিঙ্গেল্ আত্মজীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি নারিজাতির বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া সকল দেশের স্ত্রীজাতির অবস্থার বিশেষ সংবাদ রাখিতেন। তিনি রুষ ও ইংলণ্ডের সমরকালে ক্রীমিয়া প্রদেশে যাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদিগের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন। যখন যে কোন জনহিতকর কার্য্যের প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার বিশ্বপ্রেমে সকলে মোহিত হইয়াছে। তাঁহার নাম সর্ব্বত্র সম্মানের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। তিনি নিজ জীবনে প্রীতি ও পবিত্রতার সাধন করিয়া সেই প্রীতি এবং সেবার ভাব পাপী, তাপী, দরিদ্র নরনারীর দুর্গতি হরণের জন্য প্রসারিত করিয়াছিলেন। ভগিনী ডোরা আমরণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার ধন ছিল, অতুল সৌন্দর্য্য ছিল, জীবনের বিলাসময় সুখালোকিত ছবি তাঁহার

সম্মুখে ছিল, তাঁহার শরীর দুর্ব্বল ছিল, তথাপি তিনি যাবজ্জীবন বিশ্বহিতব্রতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বার্থ-ত্যাগ, ধর্ম্মভাব, অমায়িকতা, প্রীতি এবং দৃঢ়তার কথা পাঠ করিলে মনে হয় তোরা মানবী নহেন, দেবী? হাসপাতালের রোগীদিগের শুশ্রূষাই তাঁহার জীবনের মূল কর্ত্তব্য ছিল। তিনি আপনার জীবনকে রোগীদিগের আশ্রমের ধাত্রীর পদবীতে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি এই কার্য্যের জন্য যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, অমিত অধ্যবসায় এবং গভীর প্রীতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনু-করণীয়। ইহাঁদের আদর্শ জীবন চক্ষুর সম্মুখে অবিরত বর্ত্তমান থাকিলে মানুষ দেবতা হইয়া যায়।

বিশ্বসেবা নানা প্রকারে সাধিত হইতে পারে। রোগীদিগের আশ্রম, দরিদ্র পরিশ্রমাক্ষম ব্যক্তিগণের সাহায্য-সভা, বিধবা এবং অনাথ বালক বালিকাদিগের আশ্রম, কারাসংস্কার সভা, জ্ঞান-বিস্তার-সভা, অত্যাচার-প্রতীকার-সভা, প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে জনসাধারণের হিতসাধন করা যাইতে পারে। স্ত্রীলোকেরা সেবা শুশ্রূষা দ্বারা জনহিতব্রতের অনেক সাহায্য করিতে পারেন। রোগীদিগের আশ্রমের অধিকাংশ কর্ত্তব্য রমণীর দ্বারাই উত্তম-রূপে সাধিত হইতে পারে। রোগীর শয্যা-পার্শ্বে রমণী যেরূপ সাহায্য করিতে পারেন, পুরুষ সেরূপ পারে না। শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান, স্ত্রীলোকের দ্বারা উত্তমরূপে হইতে পারে। রমণী যদি বিশ্বসেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়া দরিদ্রপল্লি, অন্তঃপুর, প্রভৃতি পরিদর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলে কত হতভাগ্য নরনারীর দুঃখরাশি কমিয়া যায়। রমণী শান্তিরূপিণী, তাঁহার শক্তিতে বিশ্বের দুঃখ পর্য্যন্ত হইয়া যাইতে পারে।

শিশুজীবন ও কিণ্ডার গার্টেন।

সর্ব্বপ্রথম বাধ্যতা—উহা শৈশবাবস্থায় বিদ্যাশিক্ষার একান্ত উপযোগী। শিশুকে শিক্ষা দিবার সময় বাধ্যতা ব্যতীত পিতা-মাতা কিরূপে তাহাকে শাসনে রাখিবেন? কিন্তু উহা সন্তানের প্রতি প্রেম ও বিশ্বাসের ফল স্বরূপ হওয়া উচিত। সেই জন্য শিশুকে এরূপ বশীভূত করিতে হইবে যে, অবাধ্যতা কাহাকে বলে তাহা সে জানিবে না। শিশুকে বাধ্য করিবার জন্য শিশুর প্রতি যত আদেশ ও নিষেধ করা যায়, তাহার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উহাদিগের প্রতি অতিরিক্ত প্রভুত্ব দেখান উচিত নহে, এবং সকল বিষয়ে নিজের সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে।

পিতা মাতার ইচ্ছা ও আজ্ঞা শিশুদিগের হৃদয়ে রাজবিধির ন্যায় হওয়া উচিত, তাহা

হইলে তাহারা প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত উহা পালন করিবে। যে যে বিষয়ে পিতা মাতার আদেশ ও নিষেধ থাকিবে, তাহা স্পষ্টরূপে খুলিয়া বলিতে হইবে। শিশুকে মিষ্ট কথায় বশ করিবার আশায় সর্ব্বদা তাহাকে স্তোকবাক্য বলিয়া তাহার স্বভাব বিকৃত করা উচিত নহে। শিশুকে এরূপ ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহার নিজের স্বতন্ত্র মত থাকিলেও সে পিতা মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখন কোন কাজ করিতে না পারে। কোনও কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া অল্পক্ষণ পরে শিশুর আবদারে বিরক্ত হইয়া পুনরায় সেই কাজ করিতে আদেশ দিলে, সে ভাবিবে ঐরূপ করিলে পিতা মাতার অনুমতি পাইব। অতএব আর তাহার ভয় থাকিবে না।

প্রত্যেক শিশুকে তাহার পুষ্টিসাধনের উপযুক্ত যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক। ক্রমাগত তাহাকে আজ্ঞা বা নিষেধ করিলে তাহার মনে গোলমাল বাধে, সে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলিতে অক্ষম হয়। অন্য দিকে উহাতে শিশু ভাবে যে, তাহার প্রতি অবিচার করা হইতেছে। আর অনেক সময় আদেশ ও নিষেধের কথা এক সঙ্গে বলাতে সে তাহার ক্ষুদ্র মনে কোন্‌টা উত্তম ও কোন্‌টা আবশ্যক তাহা বুঝিতে পারে না। শিশুর মনে বিচার ও অবিচারের ধারণা এরূপ দৃঢ় শিকড় বাঁধিয়া থাকে যে, সে পিতা মাতার কোন্ আজ্ঞাটী উচিত, আর কোন্‌টী অনুচিত, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে ও অন্যায় আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করে। সুতরাং যতক্ষণ শিশু নিজের ইচ্ছামত চলিলে তাহার নিজের বা অন্যের অপকারের সম্ভাবনা না থাকে, ততক্ষণ তাহাকে বাধা না দিয়া তাহাকে ইচ্ছামত খেলিতে ও চলিতে দেওয়া উচিত। তৎসঙ্গে ইহাও তাহার মনে দৃঢ় অঙ্কিত করা উচিত যে, পিতা মাতা কোন কর্ম্ম করা অন্যায় বিবেচনা করিলে সে হাজার আবদার করিলেও কখন তাহাতে অনুমতি পাইবে না। শিশুর যে সকল দোষ বড় হইলে আপনাপনি চলিয়া যাইবে, সে তখন যে সকল বিষয়ে ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে শিখিবে, সে সকল দোষ ও বিষয় লইয়া তাহাকে বৃথা জ্বালাতন করা ঠিক নহে। ইহার মধ্যে শিষ্টাচার একটী বিষয়। বাল্যকালে শিশুকে নম্র ও ভক্তিমান্ হইতে শিক্ষা দিতে পারিলে, ভবিষ্যৎ জীবনে শিশু শিষ্টাচার ও অমায়িকতা প্রকাশ করিতে শিখিবে। শিশুকে, কি ছোট কি বড়, সকল লোককে এরূপ সমান ভাবে দেখিতে শিখাইতে হইবে যে, সে উহা দেবতার আজ্ঞার ন্যায় মানিবে। শিশুদিগকে ধনী ও সম্পত্তিশালীর প্রভেদ না শিখাইয়া নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রবীণ, বৃদ্ধ ও জ্ঞানী লোকদিগকে মান্য করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। শিশুর সম্মুখে কখন পরনিন্দা, ঝগড়া বা তর্ক করা যেন না হয়। কোন প্রকার অশ্লীল ভাব বা বাক্য

তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া ঐ নির্ম্মল আত্মাকে যেন মলিন না করে। কিছুতেই ঐ পবিত্র আলোকময় মনটিকে যেন সন্দেহঃ ও বিষাদপূর্ণ না করে।

স্বার্থপরতা শিশুদিগের একটী সাধারণ দোষ। শিশুদিগকে সর্ব্বদা অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে খেলিতে দিলে ও মাতার অপরিসীম প্রেম দ্বারা তাহাকে ভাল বাসিতে শিখাইলে শিশু আপনা আপনি সঙ্গি-প্রিয় হইবে ও ছোট ভাই ভগিনী-দিগকে স্নেহ করিতে শিখিবে। অপরিচিত লোকের সম্মুখে বা পাঁচজনের কাছে শিশুদিগকে শান্ত রাখিবার ইচ্ছা হইলে, তাহাদিগকে পৃথক্ ঘর বা বাড়ীর এক অংশ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। সেখানে তাহারা যেন অবাধে যত ইচ্ছা লাফান, দৌড়াদৌড়ি, খেলা ও শব্দ করিতে পায়, তাহা হইলে অন্য সময়ে মাতার নিকট আসিলে সহজেই তাহারা শান্ত ও স্থির থাকিবে। শিশুকে দিনরাত মাতার চক্ষুর সম্মুখে রাখা উচিত নয়, কারণ তাহা হইলে 'মা বিরক্ত হইবেন' ভাবিয়া সে সর্ব্বদা ইচ্ছামত লাফালাফি করিতে পারে না। শিশু যদি দৈবক্রমে কোন জিনিষ ভাঙ্গিয়া ফেলে,তাহা হইলে তাহাকে শাস্তি না দিয়া তাহাকে ভবিষ্যতে অধিকতর সতর্ক হইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। উহাতে বাল্যকাল হইতে সে সাবধান ও ধীর হইবে। আর যে গৃহস্থ পরিবারে শিশুদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র ঘর দিবার সুবিধা নাই, তাঁহারা সকালে ও বৈকালে উঠানে বা ছাদের উপর শিশুদিগকে ছাড়িয়া দিবেন। বাড়ীর নিকট যদি কোন শিশু-বিদ্যালয় থাকে, তাহা হইলে শিশু-দিগকে তথায় পাঠাইয়া দিলে তাহারা অনেক সঙ্গী ও খেলিবার স্থান পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইবে।

শিশুদিগকে অবাধে খেলিতে দেওয়া তাহাদিগর দুষ্টামি থামাইবার ঔষধ। উহার অভাব হইলেই তাহারা অতিরিক্ত দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে, জিনিষপত্র ভাঙ্গে ও সকলকে অস্থির করিয়া তুলে। সেই নিমিত্ত শিশুর কার্য্য করিবার শক্তিকে কোন না কোন কার্য্যে বা ক্রীড়ায় সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখা উচিত। মাটির ঘর প্রস্তুত, কানামাচি বা লুকাচুরি খেলা প্রভৃতি দ্বারা ইহা অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে।

ভিকারিণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শব্দীর উদ্দেশে।

গভীরা রজনী। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। নৈশ গগনের নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে সৌদামিনী হাসিতেছিল। ক্রমে আকাশমণ্ডল কৃষ্ণ নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রকৃতি আপনার ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রলয়-ঘোর-গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। সুযোগ বুঝিয়া প্রবলবেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইল। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বৃক্ষাদির সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রভঞ্জন আপনার সহযোগিনী বৃষ্টিকে ডাকিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। এই প্রকৃতির ঘোর দ্বন্দ্বের সময় ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া একটী যুবক ঊর্দ্ধশ্বাসে গ্রামের দিকে ছুটিতেছিলেন। তিনি ঘনান্ধকার প্রযুক্ত মধ্যে মধ্যে বিপথগামী হইতেছিলেন, কিন্তু বিদ্যুতালোকে আপনার গন্তব্য পথ যতদূর সম্ভব নির্ণয় করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর এই ভাবে অগ্রসর হইতে না হইতেই সহসা অবলার কণ্ঠনিঃসৃত অস্ফুট করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি আপনার গন্তব্য পথ ভুলিয়া গেলেন, এবং যেদিক হইতে সেই শব্দ শ্রুত হইতেছিল দ্রুতপদে সেই দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে নির্জ্জন প্রান্তরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়া তিনি অনতিদূরে একটী দীপালোক দেখিতে পাইলেন। সেই দীপালোক লক্ষ্য করিয়া শীঘ্রই একখানি নাতিদীর্ঘ কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। এই কুটীর হইতেই সেই অস্ফুট-শ্রুত বিলাপধ্বনি উত্থিত হইয়াছে মনে করিয়া তিনি তাহার দ্বারে আঘাত করিলেন। অনর্গলাবদ্ধ দ্বার অমনি খুলিয়া গেল। একটী নবীনা রমণী বর্ত্তিকা হস্তে দ্বারদেশে আসিয়া অপরিচিত ব্যক্তির মুখাবলোকন করিয়া যেন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। আগন্তুক দীপালোকে যুবতীর রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন। রমণী ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী। গৌরবর্ণ দেহলতাটী যৌবনহিল্লোলে হিল্লোলিত, উষাকাশের সুকুমার অরুণ-প্রভার ন্যায় লাবণ্যব্যঞ্জক রূপরশ্মি যুবতীর সর্ব্বাঙ্গ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাহার আলুলায়িত নিবিড় কৃষ্ণ-কুন্তল-রাজি পৃষ্ঠোপরি পতিত হইয়া অনিন্দ্য সুন্দর দেহলতাটী আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল। যুবতী হঠাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় বড়ই লজ্জিতা হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া রহিলেন। যুবকও একাকিনী যুবতীর গৃহদ্বারে আসিয়া বড়ই অপ্রতিভ

হইলেন। যুবক লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "কোনও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমি এখানে আসিয়াছি, অপরাধ লইবেন না"। রমণীসুলভ লজ্জাভারে তাঁহার মুখখানি আরও অবনত হইল। তিনি নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার উত্তর দিবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া আগন্তুক আবার বলিলেন, "আমি অদূরবর্ত্তী গ্রামাভিমুখে যাইতেছিলাম, অবলার কাতর কণ্ঠস্বর শ্রবণে তাঁহার আশু বিপদ মনে করিয়া তাঁহারই উদ্ধারকল্পে সেই কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন"। এইবার তরুণী উত্তর করিলেন, তিনি বীণাবিনিন্দিত স্বরে আগন্তুকের কর্ণকুহরে অমৃত ঢালিয়া বলিলেন, "গৃহে আমি একাকিনী, কাজেই উপযুক্ত অতিথিসৎকার করিতে পারিতেছি না। আপনি ঐখানে বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন; পিতা বোধ হয় এখনই গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। তিনিও অবলা নারীর করুণস্বরে বিপদ ভাবিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থে বাহির হইয়াছেন"। এই কথা বলিয়া রমণী বর্ত্তিকাটী সেই স্থানে রাখিয়া গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। যুবক বিশ্রামার্থ তথায় বসিয়া রহিলেন। সুন্দরীর সেই অমৃততুল্য মধুর কণ্ঠস্বর যেন তাঁহার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে বাজিতেছিল। তিনি নীরবে বসিয়া সেই কাতর কণ্ঠধ্বনির কথা ভাবিতে লাগিলেন।

ক্রমে ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল। আকাশ পরিষ্কার হইল। শুক্লপক্ষের দশমীর চন্দ্র নক্ষত্রপরিবেষ্টিত হইয়া হাসিতে লাগিল। অমল ধবল জ্যোৎস্না-স্নাত নিশীথিনী হাস্যময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের অশেষ শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন দেখাইতে লাগিল। যুবক বসিয়া কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে বাহিরে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। তিনি ভাবিলেন বোধ হয় গৃহস্বামী আসিতেছেন। অপর পার্শ্বের দরজায় করাঘাত শুনা গেল। কে যেন বাহির হইতে ডাকিলেন, "কমল, কমল"! ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র কমলিনী পিতার নিকট আগন্তুকের কথা জ্ঞাপন করিলেন। বৃদ্ধের নাম জীবনস্বামী, তিনি আপনার সিক্ত পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আগন্তুকের সমীপবর্ত্তী হইলেন। আগন্তুক তাঁহাকে দেখিবামাত্র আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যথাবিহিত অভিবাদন করিলেন। জীবনস্বামী তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়! আপনার পরিচয় পাইলে বড়ই সুখী হই।" আগন্তুক আপনার যথাযথ পরিচয় দিয়া তাঁহার তথায় আগমনের কারণ আদ্যোপান্ত সমস্ত জীবনস্বামীর নিকট বলিলেন। অনন্যমনে সেই সকল কথা শুনিয়া জীবনস্বামী বলিলেন, "আমি এবং আমার একমাত্র কন্যা কমলিনী ভয়ানক ঝড় বৃষ্টির আড়ম্বরে নিদ্রোত্থিত হইয়া ঐরূপ রমণীকণ্ঠনিঃসৃত স্বর শুনিতে পাই।

ঐ স্বর শুনিবামাত্র প্রকৃতির এই মল্লযুদ্ধের কালে কমলিনীকে একাকিনী কুটীরে রাখিয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া কুটীরের বাহির হই। অনেক অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কোথাও কোন চিহ্ন পাইলাম না, তাই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।” এইরূপ দুই জনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। বৃদ্ধ জীবনস্বামী কথা প্রসঙ্গে তাঁহার নিকট এ কথাও ব্যক্ত করিলেন যে, তাঁহার যুবতী কন্যা তথনও অবিবাহিতা। তাহার বিবাহ বিষয়ে একটী বিষম অন্তরায় থাকাতে তিনি সর্ব্বদাই চিন্তিত আছেন। যুবকের নাম হেমচন্দ্র। তিনি বৃদ্ধের বিমর্ষভাব দেখিয়া বলিলেন “মহাশয়! আপনার কন্যার বিবাহের বয়স অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে অথচ আজও অবিবাহিতা, ইহার কারণ কি? পাঠকপাঠিকাগণ যদি এই মুহূর্ত্তে কমলিনীর মুখখানি দেখিতে পাইতেন, তবে দেখিতেন যে, তাঁহার প্রস্ফুটিত কমলবৎ নয়নদ্বয় নিশার শিশিরাভিসিক্ত ফুল্ল নলিনীদলবৎ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছে। জীবনস্বামী উত্তর করিলেন, “সে বিষম অন্তরায় আর কিছু নহে, কমলিনী যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে না পাইলে আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না, ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা।”

হেম। সেই সৌভাগ্যবান্ পুরুষ কে, তাহা জানিতে পারি কি?

জীবন। আমি তাহাকে কোন দিন দেখি নাই, চিনি না, তাহার নাম কি তাহাও জানি না, সুতরাং কিরূপে আপনাকে তাহার পরিচয় দিব? শুনিয়াছি সে নিরুদ্দেশ।

হেম। আপনি কি নিজে খুঁজিয়াছিলেন?

জীবন। তাহাকে কখনও দেখি নাই, তাহার পরিচয়ও জানি না, তাহার বাসস্থান কোথায় তাহাও জানি না, সুতরাং অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার কোনও সন্ধান পাইলাম না।

হেম। আপনার কন্যাও কি তাহার কোনও পরিচয় অবগত নহেন?

জীবন। তাহা জানি না, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কোনও উত্তর দেয় না, উপরন্তু কাঁদিয়া আকুল হয়। সেই জন্য আমিও তাহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করি না।

হেম। তাহার সহিত আপনার কন্যার কোথায় সাক্ষাৎ হয়?

জীবন। আমি তীর্থপর্য্যটন মানসে বালিকা কমলিনীকে আমার এক বিশ্বস্ত বন্ধুর বাড়ীতে রাখিয়া যাই। তখন তাহার বয়স দ্বাদশ বৎসর। সেই সময়েই নাকি কমল একটী যুবকের প্রণয়দৃষ্টিতে পতিত হয়। ক্রমে তথায় উভয়েই উভয়ের প্রতি আসক্ত হয়। কমলিনী গোপনে তাহাকে পতিত্বে বরণ করে। যুবক কমলিনীর মনের ভাব বুঝিতে পারিল। পাছে এই গুপ্ত প্রণয়ে আমি কমলিনীর উপর অসন্তুষ্ট হই, এই ভয়ে যুবক বহু কষ্টে আত্মদমন করিয়া কমলিনীকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে। সেই হইতেই যুবক নিরুদ্দেশ।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে, বিলাতের রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটীর সভ্য-পদে স্ত্রীলোকগণ স্থান প্রাপ্ত হইবেন এরূপ মত প্রকাশিত হইয়াছে।

২। বঙ্গদেশের বালিকাদিগকে কিরূপ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য এই বিষয় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এক কমিটি স্থাপন করিয়াছেন। মিঃ নেথান এই কমিটির সভাপতি এবং শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর, প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর মিঃ কমিং, বেথুন কলেজের লেডী প্রিন্সিপাল, ঢাকার ইডেন স্কুল ও কলিকাতার ট্রেনিং স্কুলের লেডী প্রিন্সিপাল, ডায়োসেসিয়ান কলেজের লেডী প্রিন্সিপাল, ভিক্টোরিয়া ইউনাইটেড মিশন ট্রেনিং কলেজের ও কৃষ্ণনগর ট্রেনিং কলেজের লেডী প্রিন্সিপাল, মিস আউলস, মিস উইলিয়ামসন, শ্রীমতী জে, সি, বসু, মিস্ মুর, শ্রীমতী পি, মুখার্জ্জী, শ্রীমতী এস, সি, মুখার্জ্জী, শ্রীমতী পি, চাটার্জ্জী, নবাব আলি চৌধুরী, ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, আনন্দচন্দ্র রায়, পি, কে, সেন প্রভৃতি কমিটির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। লেডী হার্ডিঞ্জের বিপৎপাতে ভারতীয় নারীদিগের প্রাণে যে আঘাত লাগিয়াছে ও এই বিপদে তাঁহার যে অসাধারণ ধৈর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দেখিয়া যে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য নানাস্থানে সভা হইতেছে। বঙ্গের নারীগণ মিলিত হইয়া লেডী হার্ডিঞ্জ মহোদয়াকে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

৪। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, ভারতসচিব ১০৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা ভারতবর্ষে প্রচলন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

৫। জার্ম্মাণ অধ্যাপক হ্যান্সটেটলেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, পুষ্পের সঙ্গীত-অনুভূতি-শক্তি আছে। সুমিষ্ট সুরে পুষ্প বিকশিত ও উহার বিপরীত সুরে মুদ্রিত হইয়া থাকে।

৬। জার্ম্মাণ পণ্ডিত ওল্ডেনবার্গ সাহেব ও ফরাসী মহিলা সুজানি কারপেলি কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ দেখিতে গিয়াছিলেন। শ্রীমতী সুজানি পিতা-মাতার সহিত ভারতে বেড়াইতে আসিয়াছেন, ইঁহার বয়স সতের আঠার বৎসর। ইনি এদেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা দর্শনে পরম প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ তাঁহার ও ওল্ডেনবার্গ সাহেবের সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় শ্রীমতী সুজানি ও ওল্ডেনবার্গ সাহেব মহোদয়কে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়াছিলেন। শ্রীমতী

[সুজানি সুমধুর ইংরাজী ভাষায় এদেশের] গুণকীর্ত্তন করেন। ইনি সংস্কৃত পড়েন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ইংরাজী গীতাঞ্জলীর প্রথম সংস্করণ লণ্ডনে ছয় সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

জার্ম্মণীতে এক বৃহদাকারের কামান নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে যে গোলা ব্যবহার করা হইবে, তাহার এক একটীর ওজন ২৭॥০ মণ।

৯। মটর জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার জন্য এক কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। ইহার মূলধন এক কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

সমালোচনা।

পোষ্যপুত্র—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত। মূল্য ১।০ আনা। ইহা একখানি সামাজিক উপন্যাস। লেখিকা পিতৃচরণে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে বর্ত্তমান সময়ের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। চরিত্র-চিত্র অঙ্কনে লেখিকা সিদ্ধহস্ত। ইহাতে সকল চরিত্রগুলিই বেশ ফুটিয়াছে। শান্তি ও হেমেন্দ্রের চিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে। রজনী বাবুর আদর্শও অতি মহৎ ও শিক্ষণীয়। সর্ব্বসাধারণে 'পোষ্যপুত্র' যে আদরণীয় হইবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বঙ্কিম বাবুর ন্যায় এ পর্য্যন্ত কেহ উপন্যাস লিখিতে পারেন নাই, আমরা আশা করি এই প্রতিভাশালিনী লেখিকা সেই পথ অনুসরণ করিয়া যশস্বিনী হইবেন।

মানস প্রসূন বা মায়াবতী—সাধনা-রচয়িত্রী প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। প্রকাশক শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রায়, উকীল হাইকোর্ট। প্রকাশক তাঁহার নিবেদন-পত্রের মধ্যে লিখিয়াছেন, রচয়িত্রী এই কাব্যখানি পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে রচনা করেন এবং কাব্যচ্ছলে হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব সমুদায় ইহাতে বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

কাব্যখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যারপর নাই আনন্দ লাভ করিয়াছি। এইরূপ সরল, সরস ও চিত্তাকর্ষক কাব্য বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাব্যখানি উপন্যাসের ন্যায় একটী সুন্দর গল্প লইয়া রচিত। লেখিকার নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই, ইনি 'সাধনা' প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত হইয়াছেন। সাধনার ন্যায় মানসপ্রসূন-রচনাতেও তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন।

বামারচনা।

অন্তরতম।

তুমি যে আমার নিকটে রয়েছ
ফিরে তা দেখিনি কভু,
বৃথা অন্বেষণে দুয়ারে দুয়ারে
ফিরেছি প্রভু!
বিশ্বের মাঝে আপনারে লয়ে
পড়েছিনু একাধারে,
বুঝিতে পারিনি এত ব্যাকুলতা
কাহারে পাবার তরে।
সম্মুখে যাহা কিছু পাইয়াছি আঁকাড়ি
ধরিতে গিয়া,
নিমেষে নিমেষে তাহাদেরই সাথে
ভাঙ্গিয়া গিয়েছে হিয়া।
তথাপি তাদের আপন জানিয়া
বাসিয়া ছিলাম ভাল,
শেষে দেখি হায় কোথা চলে যায়
সবই আলেয়ার আলো।
ব্যথাভরা প্রাণ কারে দিব দান
দিনু তাই তব পায়,
আজিই এ চিত্ত তৃপ্ত হইল শান্তির
সুধাশায়।
শান্ত শরীরে, অচল চরণে বসিনু
আপন ঘরে,
তোমার বিশ্বমোহন মুরতি
হেরিনু নয়নভরে।
অন্তরে আছ অন্তরে নাই
আজ বুঝিয়াছি স্বামী,
অন্তরতম অন্তরেই রহ
এই শুধু যাচি আমি।

শ্রীমতী সরসীবালা দেবী।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

১

নীরব নীস্তব্ধ এবে নদীয়ানগর।
নীরব নিশীথ রাতি, ছড়ায়ে বিমল ভাতি,
হাসিতেছে শশধর গগন উপর।

২

নদীয়ার গৃহে গৃহে নিদ্রিত সবাই।
করি নাম সঙ্কীর্ত্তন, নিদ্রিত ভকতগণ,
হায়রে! জানেনা কেহ পালাবে নিমাই!

৩

কপট নিদ্রায় মগ্ন গোরা মনোহর।
পতিপদ ধরি বুকে, বিষ্ণুপ্রিয়া মনসুখে
নিদ্রা যায় পতিপাশে হয়ে অকাতর।

৪

জানেনাক অভাগিনী আজি তার শেষ!
হৃদয়ে হানিয়া বাজ, প্রাণেশ তাহার আজ
চলে যাবে চির তরে কাঁদাইয়া দেশ।

৫

উঠ দেবি ! কত নিদ্রা যাও মৃতপ্রায় ?
উঠে কর দরশন, তোমার জীবন ধন
সোণার গৌরাঙ্গ আজি সন্ন্যাসেতে যায়।

৬

চুপে চুপে উঠি গোরা করে পলায়ন।
জাগি পাছে শচীমাতা, জাগি পাছে স্বর্ণলতা
বিষ্ণুপ্রিয়া পতিব্রতা, করে নিবারণ।

৭

আয়রে নদীয়া-বাসি ! আয় আয় আয় !
তোদের চরণে দলি, গোরাচাঁদ যায় চলি,
প্রেমের নিগড় দিয়া বেঁধে রাখ তায়।

৮

শচীমাতা, শীঘ্র আসি ধর গো গোরায়।
চলে গেলে একবার, জীবনে পাবে না আর,
ধর ধর শীঘ্র ধর ঐ চলে যায়।

৯

জীবের উদ্ধার হেতু বিলাইতে নাম
কাটিয়া মায়ার ফাঁদ, চলে যায় গোরাচাঁদ,
জীবের দুঃখেতে দুঃখী গোরা প্রাণারাম।

১০

এত দয়া কার প্রাণে কে দেখেছে কবে ?
মানবের হিত লাগি, কেবা হয় সর্ব্বত্যাগী ?
এত দয়া কার প্রাণে, দেবে কি মানবে ?

১১

পাপী তাপী আচণ্ডালে তারিলে দয়াল,
অজ্ঞান অধম আমি, তুমি প্রেমময় স্বামী,
কৃপা করি শ্রীগৌরাঙ্গ ! স্থান দেহ পায়।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র

সাধ।

সাধ মম বহুদিন, কারে ইহা বলিব,
এ ঘোর পিপাসা হায় কেমনে বা মিটাব,
অন্তরের কোণে যাহা,
লুকান আছেরে আহা,
এ অনন্ত আশা আমি, কাহারে বা দেখাব,
প্রাণের এ জ্বালারাশি কেমনে বা জুড়াব।
তাই বলি পরমেশ,
দয়াসিন্ধু ব্যোমকেশ,
দেখাইয়ে দাও পথ, প্রাণে শান্তি পাইব,
না কর করুণা যদি কোথা ভেসে যাইব।
আসিয়াছি হেথা কেন,
বল তাই প্রিয়তম,
এমনি ক'রেই কিগো এ জীবন কাটা'ব,
তোমায় না দেখালে আর কারে বা দেখা'ব।
নাহি জ্ঞান, নাহি শিক্ষা,
নাহি মন্ত্র, নাহি দীক্ষা,
প্রাণেশ ! এমনি করে পরকাল হারা'ব,
সাধের জীবন তরী অকূলে কি ভাসা'ব ?
সকলি জানিছ তুমি,
তুমিত অন্তরযামী,
বহুদিন সাধ মম তোমারে যে পূজিব,
ও পূত চরণ হায় সব দিন স্মরিব।
হৃদয় নিভৃতে যাহা,
কইগো পূরিল তাহা,

ভবেশ, ভবানীপতি, বল কিসে তরিব,
শূন্যবুকে, শুষ্কমুখে, যেইদিন মরিব।
যার হৃদি তোমা ছাড়া,
সেতগো সকলি হারা,
অসার সংসারে আর কতদিন কাঁদিব,
কতদিনে ওই পদ পুজিবারে শিখিব।
কি করিনু এসে ভবে,
ভাবিতে বসিব যবে,
হায় হায় চারি দিক শূন্যময় হেরিব,
প্রাণে এই জ্বালা নিয়ে কতদিন থাকিব।
মনে ভাবি কতবার,
ওই পদ পুজিবার,
ভুল হয়ে যায় কেন কি উপায় করিব,
ভেঙে দাও ভুল মম শান্তিনীরে ভাসিব।

এ কি।

নিশায় শিশিরসিক্ত কমলের দল,
কেন মোর গৃহে এরা হাসে খল খল।
কেন এ বাগান আমি সৃজিনু যতনে,
ঢালিতেছি কেন সার এই ফুলবনে।
সুবাসিত সুকোমল কুসুম সকল,
সদা মোরে তৃপ্তিদান করে অবিরল,
আমি যে ইহাতে এত মুগ্ধ হ'য়ে আছি,
সুগন্ধে বিভোর প্রাণ, সুখে ভাসিতেছি।
এ কি! এরা কি কুহকে বেঁধেছে আমায়?
একদিন ইহাদের ছাড়া নাহি যায়।
কি এক মমতাবন্ধে জড়িত হইয়া,
গোলমালে, দিবা বিভা দিই কাটাইয়া।
কিন্তু, এই ফুলদল শুকাইবে যবে,
ভাবি না তখন মোর গতি কিবা হবে,
দিনরাতি জল সেচি গাছ না বাঁচিবে,
প্রাণের আনন্দকারী ফুল না ফুটিবে।
আর না করিবে মোরে সুবাসে আকুল,
শুকাবে ঝরিবে সে যে নাহি হবে ভুল।
এত সার এত ফুল এত হাসিরাশি,
এত যে সুগন্ধ তার এত ভালবাসি,
সবি বৃথা, কি কুহক তাই ভেবে মরি,
এত আড়ম্বর তবে মিছা কেন করি?

স্বর্গীয়া হেমন্তকুমারী সেন গুপ্তা
আড়কান্দী, ফরিদপুর।

১৬।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 596. April, 1913.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৯৬ সংখ্যা।	চৈত্র ১৩১৯। এপ্রেল ১৯১৩।	১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কাপ্তেন স্কটের মৃত্যু—কাপ্তেন স্কট্ কয়েকজন সহচর লইয়া দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, খাদ্যাভাবে সহচরবৃন্দসহ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

রাজকার্য্যে রমণীর গৌরবলাভ—লর্ড কারমাইকেল মহোদয় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের সহকারীর পদে নিযুক্তা মিস্ কর্ণেলিয়া সোরাবজির কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার কার্য্য স্থায়ী করিয়াছেন। মিস্ কর্ণেলিয়া ও তাঁহার পরবর্ত্তী সকলেই এই কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুযায়ী পেন্সন প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

কুমারী সুজানি কার্পেলিকে উপাধি দান—সংস্কৃত কলেজের মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক পণ্ডিত-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতমণ্ডলী ফরাসী কুমারী সুজানিকে 'ভারতী' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এই বিদেশিনী কুমারীর শিক্ষালাভের স্পৃহা ও অধ্যবসায় দেখিয়া আমাদের তাহা শিক্ষা করা উচিত। আমরা সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ উদাসীন রহিয়াছি, তাহাতে লজ্জিত হইতে হয়।

কলিকাতার বৃক্ষতত্ত্বাবধান—কলিকাতা স্কোয়ার এবং উদ্যানসমূহে ও পথপার্শ্বে যে সকল বৃক্ষ আছে, তাহাদের বিশেষ তত্ত্বাবধানের প্রস্তাব হইতেছে।

কংগ্রেসের আয়োজন—আগামী বর্ষে করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, এইরূপ সংকল্প হইয়াছে ও আয়োজন হইতেছে।

পালোয়ানের পুরস্কার—বিখ্যাত

পালোয়ান রামমূর্ত্তির ক্রীড়া-কৌশল দর্শনে হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর সন্তুষ্ট হইয়া নগদ প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা, হীরক-অঙ্গুরী ও ঘড়ীর চেন পুরস্কার দিয়াছেন।

শ্রীমতী সত্যবালা দেবীর অভ্যর্থনা—সঙ্গীতবিদ্যায় সুনিপুণা শ্রীমতী সত্যবতী দেবী সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বসুমতী কার্য্যালয়ে এক সান্ধ্য সম্মিলনের আয়োজন হইয়াছিল। সভায় বহু পণ্ডিত-মণ্ডলী ও সাহিত্যিকগণের সমাবেশ হইয়াছিল। সত্যবালা দেবী সুমধুর স্বরে একটী বেদগান করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

ভূত না মানুষ?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দেবদত্তের দুর্ভাগ্য ও নন্দকের সৌভাগ্য।

দেবদত্ত আপন পত্নীর গলার স্বর্ণপদক দর্শন করিয়া অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ধূলাবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তাঁহার পদ্ম চক্ষু নিমীলিত হইয়া রহিল। তাঁহার পরম হিতৈষী নন্দক কর্ত্তব্য কর্ম্মানুরোধে তাঁহার স্ত্রীর অনুসন্ধানের সহায়তা করিবার জন্য তাঁহাকে জ্ঞানহীন অবস্থায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি এখন ঘোর শক্রমণ্ডলীর মধ্যে জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে। তখন পৃথিবীর কতক স্থান জোৎস্নায় পূর্ণ, কতক স্থান অন্ধকারে আবৃত, কারণ বনের মধ্যে বৃক্ষতলে অর্থাৎ যে যে স্থানে চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না, সেই সেই স্থানে অন্ধকার, তদ্ব্যতীত সর্ব্ব স্থান জোৎস্নায় পূর্ণ।

নন্দককে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কয়েকজন অদ্ভুতাকৃতি লোক আসিয়া দেবদত্তকে ঘিরিয়া বসিল। তখন বনের চারি দিকে অনেক ফুল ফুটিয়াছে। এই কৃত্রিম বন ব্যতীত বোধ হয় অন্য কোন বনে এত অধিক সুবাসিত ফুল বিকশিত হয় না। যাহারা দেবদত্তকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল, তাহারা কি প্রকারে দেবদত্তকে বধ করা যায় তাহার কল্পনা করিতেছিল। দেবদত্ত চণ্ডদেবের প্রধান শত্রু, কারণ চণ্ডদেব দেবদত্তের স্ত্রী অপহরণ করিয়াছেন। এই প্রধান শত্রুকে হাতে পাইয়া হত্যা না করিয়া কিছুতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। তখন অনেকেই অনেক প্রকার কল্পনা করিতে লাগিল। কেহ বলিল উহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেল। কেহ বলিল উহার গলা কাটিয়া ফেল। কেহ বলিল উহাকে অজ্ঞানাবস্থাতেই আগুনে ফেলিয়া দাও। একজন বলিল—"না, এ সবে প্রয়োজন নাই। অজ্ঞানাবস্থায় ইহাকে স্রোতস্বিনীর মধ্যে ফেলিয়া দাও, সে নিজে নিজেই

মরিবে। আমরাও তাহার মৃত্যুর অপরাধ হইতে মুক্তি পাইব। এই উপায়ে সে নিশ্চয়ই মরিবে এবং আমরা তাহার মরণান্তে মৃত্যুর দণ্ড হইতে বাঁচিব।

যে এই কথা কহিল, সে অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিল। সকলেই একবাক্যে তাহার কথায় সায় দিল। তখনও ফুল হাসিতেছিল, চাঁদ হাসিতেছিল, লতা নাচিতেছিল। দেবদত্তের মৃত্যু সন্নিকট দেখিয়া তাহারা কেহই হাস্য হইতে নিবৃত্ত হইল না এবং এই নরাকৃতি ভূতের অধঃপতন দেখিয়া কেহই দুঃখিত হইল না। দেবদত্ত জ্ঞানহীন হইয়া ভূমিতলে নিপতিত ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত বক্তা বলিলেন—"চল এই বেলা আমরা সকলে ধরাধরি করিয়া উঁহাকে নদীর স্রোতের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আসি।"

ইহাই ভাল মনে করিয়া সকলে দেবদত্তকে ধরাধরি করিয়া লইয়া চলিল। বনের মধ্য দিয়া কতকদূর, গমন করিয়া তাহারা এক নদীর তীরে উপনীত হইল এবং দেবদত্তকে ঐ নদীর স্রোতের মধ্যে ফেলিয়া দিল। দেবদত্তের দেহ জলে ডুবিয়া গেল কি স্রোতে ভাসিয়া গেল, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণ বুঝিয়া লউন। আমি আর এ বিষয় বিস্তৃত ভাবে লিখিয়া সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। যাহারা এই নারকীয় ও দুঃসাহসিক কর্ম্ম করিল, তাহাদের মধ্যে নন্দকের পূর্ব্বপরিচিত সেই ভীষণাকৃতি ব্যক্তিও ছিল। দেবদত্ত নিপাত হইল জানিতে পারিয়া সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিল। সে যতদূর সম্ভব দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া এ সংবাদ কর্ত্তাকে জ্ঞাপন করিয়াছিল, তাহা পাঠক পাঠিকাগণ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে অবগত হইয়াছেন। এই ঘটনার পূর্ব্বে নন্দক সম্বন্ধে যে একটী বিষম ভয়াবহ ও বিস্ময়জনক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা এখনও পাঠক-পাঠিকাগণের কর্ণগোচর হয় নাই। আমি এক্ষণে সেই ঘটনার বিষয় বলিব।

নন্দককে আমরা বহুক্ষণ ছাড়িয়া আসিয়াছি। চলুন, পাঠকপাঠিকাগণ! সেই নির্জ্জন অন্ধকারের মধ্যে তিনি একাকী কি করিতেছেন একবার দেখিয়া আসি।

সেইরূপ ভীষণ স্থানে সেইরূপ বিকট হাস্যধ্বনি শ্রবণ করিয়াও নন্দক বিচলিত হইলেন না। কেবল মাত্র তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন—কৈ, কোন স্থানেও মানুষের চিহ্ন দেখা গেল না। কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া সেই বিকট হাস্যধ্বনি নৈশ কানন বিদীর্ণ করিতেছিল। কোথা হইতে যে সেই স্বর আসিতেছিল, নন্দক তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সময় সময় দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতেছিলেন। সময় সময় তাঁহার মন বিস্ময়-সাগরে ডুবিয়া যাইতেছিল। আবার সময় সময় সন্দেহ তাঁহাকে দোদুল্যমান করিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন—এ কি হাসি, না ইহা সত্য সত্যই ভূতের খেলা? এইরূপ কর্ম্ম যাহারা করিতেছিল, তাহারা ভূত না মানুষ?

তখন চতুর্থীর চাঁদ উঠিয়াছিল। সেই ঘন নিবিড় বনের মধ্যেও স্থানে স্থানে চাঁদের আলো প্রবেশ করিতেছিল, তদ্দর্শনে নন্দকের মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইতেছিল যে, বনাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যেন তাঁহার দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া শুভ্র দশন বিকশিত করিয়া হাস্য করিতেছেন! নন্দক তখন সেই স্বল্পালোকেই সেই ভীষণ স্থানটী ভাল করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলেন। কি ভীষণ বন! কিন্তু এই বনের মধ্যেও ফুলের অভাব ছিল না। এক একটী গাছে এত ফুল ফুটিয়াছিল যে, তাহাকে ফুটন্ত ফুলের স্তবক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নন্দক দেখিলেন চারিদিকেই ঘন নিবিড় বনরাজি, কেবল তাঁহার পশ্চাতে সলিলপূর্ণ একটী পুষ্করিণী। ঐ পুষ্করিণীর উপর দিয়াই নন্দক এই স্থানে আনীত হইয়াছিলেন। তিনি বিশেষ অনুধাবন করিয়া বুঝিলেন যে, তিনি যে কূপের মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন সেই কূপের সঙ্গে এই পুষ্করিণী সংলগ্ন এবং কূপের মধ্যে এমন একটী অত্যাশ্চর্য্য দ্বার আছে যে, তদ্দ্বারা জলের মধ্যে যাতায়াত করা যায়। নন্দক আরও বুঝিলেন যে, তিনি যে পুষ্করিণী হইতে উঠিয়াছেন, ঐরূপ পুষ্করিণী আরও আছে, নচেৎ তিনি যাহার সঙ্গে জলে ডুবিয়াছিলেন, যে তাঁহাকে এই পথে লইয়া আসিয়াছিল, সে কোথায় গেল! সম্ভবতঃ সেও এইরূপ একটী পথে অন্য দিকে গিয়া থাকিবে। এখান হইতে বহির্গমনের অন্য কোন পথ আছে কি না, নন্দক তখন অনন্যমনা হইয়া তাহাই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সহসা বহু হাঁচির শব্দে নির্জ্জন বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। নন্দক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথা হইতে ঐ শব্দ আসিতেছে, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কখন উর্দ্ধ হইতে, কখন অধঃ হইতে, কখন দক্ষিণ হইতে, কখনও বা বাম দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল। সহসা হাঁচির ধ্বনি ক্রন্দন-ধ্বনিতে পরিণত হইতেছিল। করুণ অকরুণ ক্রন্দনের শব্দে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইল। এ কি? এ কাণ্ডের মূলে যথার্থই মানুষ না ভূত? এ কীর্ত্তিসমূহ কি প্রতিধ্বনিকে, না অন্য কাহাকে অপহরণ করায়?

বিস্ময়ের কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে নন্দক নিস্তব্ধ ও অন্যমনস্ক হইয়া এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি চিন্তার পথে বহুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই গভীর বনাভ্যন্তর হইতে ব্যাঘ্র ডাকিয়া উঠিল। বনগর্ভ ভেদ করিয়া গর্জ্জনের উপর গর্জ্জন আরম্ভ হইল! নন্দক এ ঘটনাতেও ভীত হইলেন না। কিন্তু বিস্ময়ে ও সন্দেহে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন—এ কি যথার্থই বাঘ?

ক্রোধে নন্দকের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। নন্দক পলকমধ্যে তীক্ষ্ণ তরবারি কোষমুক্ত করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিল

না। বরং ক্রমে ক্রমে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন থামিয়া গেল। নন্দকের আশ্চর্য্যের সীমা পরিসীমা রহিল না। তিনি জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া বনের নিবিড় হইতে নিবিড়তম প্রদেশে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তাঁহার অভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার চিত্তোদ্বেগ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার সম্মুখস্থ বৃক্ষরাজি সবেগে দুলিয়া উঠিল। পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্প, ফলবৃক্ষ হইতে ফল এবং অন্য সকল বৃক্ষ হইতে শুষ্ক পত্র ঝর ঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল।

এ কি আশ্চর্য্য! নন্দকও প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তৎপরে ভাবিতে লাগিলেন—এখন কি করা কর্ত্তব্য। তিনি এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মস্তকোপরি কতকগুলি বৃক্ষশাখা নত হইয়া পড়িল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ঝপাঝপ্ শব্দে নন্দকের পশ্চাৎস্থিত জলের মধ্যে কতকগুলি ভারী জিনিষ পতিত হইল। নন্দক বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। আর কোন স্থানে কোন সাড়া শব্দ নাই।

পর দিবস সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যাহা দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তাঁহার মন ঘোর বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে তাঁহার মাতা, এবং তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতেছে। তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন বলিয়া তাহা না দেখিলেও অনুধাবন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মাতা এইমাত্র জল হইতে তীরে উঠিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মাতা তাঁহাকে দেখিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইলেন না, বরং সন্তুষ্টচিত্তে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু-মধুর স্বরে গাহিয়া উঠিলেন—

"প্রভু!
আমি বাছিয়া লব না তোমারি দান,
তুমি যাহা দেও তাই ভালো,
(তুমি) বিষাদের
পাশে রেখেছ হরষ, আঁধারের
পাশে আলো।
আমি লব না কি তব প্রসাদের ফুল,
যদি তাহে কণ্টক রহে,
নিভাব কি পুণ্য হোমের অনল,
যদি তাহে অন্তর দহে,
বহুক শিথিল, তুলুক ঝটিকা
তোমার কৃপা পবনে,
আমি কেমনে রোধিয়া লইব শরণ
নীরব শূন্য মরণে। ইত্যাদি।

জননীর সঙ্গীত শ্রবণে নন্দকের পাষাণ প্রাণও গলিয়া গেল। তিনি জননীর পদস্পর্শ করিতেও ভুলিয়া গেলেন।

জননী পুনরায় গাইলেন—

বিশ্বরাজালয়ে বিশ্ববীণা বাজিছে,
স্থলে জলে নভঃস্থলে,
বনে উপবনে, নদী নদ গিরি গুহা
পারাবারে,
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীতমধুরিমা,
নিত্য নিত্য রসভঙ্গিমা।
নব বসন্তে নব আনন্দে, উৎসব নব,

অতিমঞ্জুল, অতিমঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল
গুঞ্জন কুঞ্জে,
শুনি মর্ম্মর পল্লবপুঞ্জে। ইত্যাদি।
(ব্রহ্মসঙ্গীত)

ইহার পর নন্দকের মাতা যে নন্দককে সেই ভীষণ স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিলেন, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

অমূল্য সুন্দরী দাস গুপ্তা।
ঢাকা।

প্রাচীন মহিলাদিগের অঙ্গাভরণ। *

যে ভারতবর্ষ মণি মুক্তা প্রভৃতি বিবিধ রত্নের এবং স্বর্ণ প্রভৃতি নানা ধাতুর আকর ছিল, সেই ভারতবর্ষে যে প্রাচীন কালে স্বর্ণ ও রত্নাদি দ্বারা প্রস্তুত আভরণ পরম যত্নে ব্যবহৃত হইত, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রাচীনকালে আভরণ সকলের মধ্যে কতিপয়সংখ্যক মাত্র রাজধার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। পুরুষদিগের ব্যবহৃত অলঙ্কারের সংখ্যা কম ছিল। অধিকাংশ ভূষণই মহিলাদিগের স্বভাবসুন্দর দেহকে আরও শোভনীয় করিবার জন্যই এতদ্দেশে সুপ্রচলিত ছিল। যদিও আর্য্য শাস্ত্রের অনেক স্থলেই আছে "শীলতাই স্ত্রীলোকদিগের ভূষণ," তথাপি গাত্রে অলঙ্কার ধারণ করিতে কাহাকে নিষেধ করা হয় নাই। তবে শীলতা-বর্জ্জিতা নারী অত্যুত্তম ভূষণে ভূষিতা হইলেও যে প্রকৃত ভাবে প্রশংসনীয়া হইতেন না, তাহাই যে ঐরূপ উক্তির অভিপ্রেত, তাহা সকলেই জানেন। মহাকবি কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের এক স্থানে লিখিয়াছেন "যাহাদিগের আকৃতি মধুর, তাহাদিগের কিই বা ভূষণ না হইয়া থাকে।" বাস্তবিক সুন্দরী রমণীগণ পুষ্পাদি দ্বারা বা মণি, মুক্তা, স্বর্ণ ও রজতাদি দ্বারা, যেরূপেই অলঙ্কৃতা হউন না, তাঁহাদিগের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যচ্ছটা কোন প্রকারেই অপ্রকাশিত থাকিবার নহে। তবে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আহরিত সৌন্দর্য্যের সহিত মিশিয়া যে এক অবর্ণনীয় প্রীতির সৃষ্টি করে, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? অতএব স্বভাবজাত শোভাকে কৃত্রিম শোভার সহিত মিশাইবার জন্য ভূষণের প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হইয়া থাকে।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে মহিলাদিগকে ভূষণাদি দ্বারা সম্মানিতা করা একটী

* এই প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে অন্য পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকায় এরূপ প্রবন্ধ থাকা অনুপযোগী হইবে না মনে করিয়া পূর্ব্ব প্রবন্ধের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ইহা বামাবোধিনীতে প্রদত্ত হইল।

প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। এ কথা এখানে বলা আবশ্যক যে, যে ভারতবর্ষে ধর্ম্মার্থে অর্থ ব্যয় করা প্রধান কর্ত্তব্যমধ্যে বিবেচিত হইত, সেই দেশের গৃহস্থ ধর্ম্মার্থে অর্থব্যয়ে বিমুখ হইয়া, লৌকিক মানমর্য্যাদা রক্ষার্থে অবস্থানুসারে ব্যয় না করিয়া, গৃহিনীদিগকে অঙ্গাভরণ দান করাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। তবে গৃহস্থদিগের বিবিধ ব্যয়ের মধ্যে মহিলাদিগের সম্মানার্থে, প্রীতি সম্পাদনার্থে এবং আরও নানাবিধ প্রয়োজনসাধনার্থে অবস্থানুসারে তাঁহাদিগকে ভূষণাদি দান করা একটী বিহিত ব্যয়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র পাঠে বুঝা যায় যে, বহুমূল্য হীরক ও মণিমাণিক্য হইতে আরম্ভ করিয়া, তাম্রাদি ধাতুও অলঙ্কার নির্ম্মাণার্থে ব্যবহৃত হইত। সুতরাং রাজাধিরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া হীনাবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যেও অবস্থানুসারে বিবিধধাতুনির্ম্মিত বিবিধ প্রকার আভরণের প্রচলন ছিল। কালিকাপুরাণে দেবতাদিগকে ভূষণদানবিধি নামক একটী অধ্যায় আছে। ঐ অধ্যায়ে দেবতাদিগের উদ্দেশে ভূষণদান (নিবেদন) করিতে হইলে অথবা স্থাপিত স্ত্রীদেবতার মূর্ত্তিকে সাজাইতে হইলে কোন্ কোন্ আভরণ দিতে হয় ও তাহা কোন্ কোন্ ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত হইলে চলিতে পারে, তাহা বর্ণিত আছে। ঐ অধ্যায় পাঠে নারীদিগের কোথায় কোন্ ধাতুতে নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহার্য্য হইতে পারে, তাহা জানিতে পারা যায়। উক্ত পুরাণ পাঠে জানা যায়, কিরীট প্রভৃতি মস্তকের আভরণ সুবর্ণনির্ম্মিত হওয়া উচিত। আর গ্রীবা হইতে আরম্ভ করিয়া পাদাগ্র পর্য্যন্ত ভূষণ সকল সুবর্ণেরও হইতে পারে এবং রৌপ্যেরও হইতে পারে। কিন্তু বিশেষ এই যে, সকল প্রকার আভরণই তাম্রনির্ম্মিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কারণ তাম্র সকল স্থলে সুবর্ণ সদৃশ বা সুবর্ণের অনুকল্প রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। আমাদের শাস্ত্রানুসারে তাম্র অতি পবিত্র ধাতু। এইজন্য তাম্রের ভূষণ ধারণে ও দেবোদ্দেশে দান করায় বিশেষ ফল আছে। পাদদেশে কেবল রৌপ্যালঙ্কার দিতে হয়, কালিকাপুরাণে এইরূপ উক্ত আছে।

পুরাকালে কেবল শোভার জন্যই মণি, মুক্তা ও স্বর্ণাদি দ্বারা নির্ম্মিত আভরণ ধারণ করা হইত না। ঐগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির পক্ষেও অনুকূল বলিয়া ব্যবহারের নিয়ম ছিল। যখন আমরা দেখি, অনেক সময়ে অষ্ট ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত মাদুলি অনেকানেক পীড়ার উপশম পক্ষে সহায়তা করে, ঔষধ বিশেষ পূর্ণ যে সকল মাদুলি ব্যবহৃত হয়, তাহা স্বর্ণ রজত ও তাম্রাদি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তখন আমরা অবশ্যই মনে করিতে পারি যে, ধাতুবিশেষ অঙ্গে ধারণের অনেক গুণ আছে। মনুসংহিতার

সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, নৃপতিগণ সর্ব্বদা বিবিধ রত্ন সকল ধারণ করিতেন। কারণ উহা সর্ব্বদা শরীরে থাকিলে শত্রুর চক্রান্তে বিষের সহিত মিশ্রিত খাদ্য, এবং দৈবাৎ দূষিত সুতরাং এক প্রকার বিষাক্ত খাদ্য ব্যবহৃত হইলে তাহা অনেক স্থলে অনিষ্ট করিতে পারে না। এইরূপে শাস্ত্রে স্বর্ণ ও রত্নাদি ধারণের অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

ভূষণং ভূষয়েদঙ্গং যথাযোগ্যং বিধানতঃ।
শুচি সৌভাগ্যসন্তোষদায়কং কাঞ্চনং স্মৃতম্॥
গ্রহদৃষ্টিহরং পুষ্টিকরং দুঃখপ্রণাশনম্।
পাপদৌর্ভাগ্যশমনং রত্নাভরণধারণম্॥
ভাবপ্রকাশঃ।

অনুবাদ। যথাযোগ্য বিধানানুসারে ভূষণ দ্বারা অঙ্গ ভূষিত করিবে। স্বর্ণ পবিত্র, সৌভাগ্যদায়ক ও সন্তোষপ্রদ। রত্নাভরণ ধারণ করিলে গ্রহের কুদৃষ্টি নিবারিত হয়, শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়, উহা শারীরিক ও মানসিক দুঃখ নষ্ট করে এবং পাপ ও দৌর্ভাগ্য বিদূরিত করে।

মৌক্তিকঞ্চ মধুরং সুশীতলং
দৃষ্টিরোগশমনং বিষাপহম্।
রাজযক্ষ্মা-পরিকোপ-নাশনম্
ক্ষীণবীর্য্যবলপুষ্টিবর্দ্ধনম্॥
রাজবল্লভঃ।

অনুবাদ। মৌক্তিকাভরণ মধুর, সুশীতল, দৃষ্টিরোগনিবারক এবং বিষদোষহারক। উহা রাজযক্ষ্মার পরিকোপ নাশ করে। যাহারা ক্ষীণবীর্য্য, মুক্তালঙ্কার ধারণ করিলে তাহাদের বল বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন হয়।

রত্নশাস্ত্রে মুক্তা সম্বন্ধে যেরূপ গুণ বর্ণিত আছে, সেইরূপ দোষও কীর্ত্তিত আছে। উৎপত্তিস্থানানুসারে এবং প্রকৃতি ও বর্ণানুসারে উহাদের নামভেদ ও শ্রেণীভেদ হয় এবং পরীক্ষা দ্বারা গুণদোষ নির্ণীত ও মূল্যাদি নিরূপিত হয়। অপ্রাসঙ্গিক ও প্রস্তাববাহুল্য হইবে ভাবিয়া ঐগুলি বর্ণিত হইল না।

কত দীর্ঘ কাল হইতে ভারতবর্ষে রত্নের ব্যবহার প্রচলিত আছে, সৃষ্টির কালনির্ণয়ের ন্যায় তাহারও কাল নির্ণয় করা কঠিন। ঋগ্বেদে "হোতারম্ রত্নধাতারম্" এইরূপ দৃষ্টান্তক্রমে রত্নের নাম থাকাতে বোধ হয় বেদপ্রধান যুগেও রত্নের সমাদর ছিল। পাতঞ্জল দর্শনে "অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে সর্ব্বরত্নোপস্থানম্" এই সূত্রে রত্নের নাম থাকাতে বোধ হয় দর্শন ও যোগচর্চ্চার সময়েও রত্ন আদরের বস্তু ছিল। মহাভারতে শুক্রনীতির নাম পাওয়া যায়, সুতরাং মহাভারতের বহুপূর্ব্বে রচিত শুক্রনীতি গ্রন্থে রত্নের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত থাকাতে বোধ হয় মহাভারতের বহুপূর্ব্বে এদেশে রত্নের প্রচলন ছিল। ইহা ভিন্ন অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতি পুরাণ শাস্ত্রে, মনু প্রভৃতি প্রণীত সংহিতা শাস্ত্রে, বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্রে, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে রত্নের বিবরণ পাওয়া যায়। অভিধানে ও কাব্যেও বিবিধ রত্নাভরণের নাম

জানা যায়। এই সকল আলোচনা করিলে বোধ হয় সত্যযুগ হইতে এদেশে মণিমাণিক্যাদি রত্ন এবং স্বর্ণাদি ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত নানা প্রকার আভরণ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

প্রাচীন আর্য্যমহিলাগণ কোন্ কোন্ আভরণ কোন্ কোন্ অঙ্গে ধারণ করিতেন, তদ্বিবরণ অমরকোষে অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত ত্রিকাণ্ড চিন্তামণি এবং মহেশ্বর পণ্ডিত কৃত অমর বিবেক, এই দুই নামে অভিহিত দুই খানি টীকা আছে। উক্ত টীকাদ্বয় এবং অমর-কোষ হইতে সংগ্রহ করিয়াই এই প্রস্তাবে বর্ণনীয় প্রধান প্রধান আভরণগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত আরও অনেকবিধ ভূষণের নাম পাওয়া যায়, সেগুলির উল্লেখ অমরকোষে নাই। সেই সকল বিবরণ অপরাপর কোষগ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করা যাইতেছে। প্রাচীনকালের আভরণগুলি কিরূপ আকারবিশিষ্ট ছিল এবং বর্ত্তমান সময়েই বা সেইগুলি কি কি নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং কোন্ কোন্ আভরণের বঙ্গ-দেশে বিরল প্রচার বা অপ্রচার দেখা যায়, তাহাও সাধ্যমত বিবৃত করা যাইতেছে :—

মণ্ডনঞ্চাথ মুকুটং কিরীটং পুন্নপুংসকম্।
চূড়ামণিশিরোরত্নং তরলো হারমধ্যগঃ।
বালপাশ্যা পরিতথ্যা পত্রপাশ্যা ললাটিকা॥

মণ্ডনকে ভূষণ বলে। মুকুট ও কিরীট এই দুইটী মস্তকাভরণ এক পর্য্যায়বাচক। (মক্ + করণবাচ্যে উট্) মস্তক ইহা দ্বারা মণ্ডিত হয় বলিয়া ইহাকে মুকুট (বা মকুট) বলে। (কৄ + কর্ত্তৃবাচ্যে কীটন্) রশ্মি বিক্ষেপ করে বলিয়া ইহাকে কিরীট কহে। মুকুটস্থ প্রধান মণির নাম চূড়ামণি বা শিরোরত্ন। মস্তকে ধারণ-যোগ্য হার গাঁথিবার সময় উহার মধ্য-ভাগে যে একটী বড় মণি দেওয়া যায়, তাহাকে তরল বলে। (তার + লা + কর্ত্তৃবাচ্যে ক) তারকাকৃতি করিয়া দেয় বলিয়া ইহার নাম তরল। উহাকে নায়কও কহে। প্রচলিত ভাষায় উহা পদক এই নামে খ্যাত।

বালপাশ্যা ও পরিতথ্যা এই দুইটী সীমন্ত ভূষণ। স্ত্রীলোকদিগের চুলে উহা পাশাকৃতিরূপে জড়ান থাকে। (বালং কেশং পাশ্যতীতি) কেশকে বন্ধন করে বলিয়া উহার নাম বালপাশ্যা। অথবা (বালপাশ + হিতার্থে যং) বালপাশের অর্থাৎ কেশসমূহের হিতকর বলিয়া উহার নাম বালপাশ্যা। উহা মস্তকস্থিতা স্বর্ণাদিরচিতা একপ্রকার পট্টিকা (পেটি বা পাড়ী)। (পরিতথা + যন্) মস্তককে যথাযথরূপে ভূষিত করে বলিয়া সম্ভবতঃ উহাকে পরিতথ্যা কহে। চলিত ভাষায় ইহার নাম শিথি।

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি মস্তকা-ভরণের নাম পাওয়া যায়। চুলের বন্ধন দৃঢ় থাকিবে, এইজন্য কেশের মধ্যে

একপ্রকার সুবর্ণনির্ম্মিত শলাকাবিশেষ (কাঁটা) প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত, ইহাকে গর্ত্তক কহে। অশ্বত্থপত্রের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, হীরা-মণি-মাণিক্যাদি-জড়িত হংসতিলক নামে একপ্রকার মস্তকাভরণ ছিল। বোধ হয় উহা এখনকার পানপাতার সদৃশ হইবে।

(ক্রমশঃ)

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মজীবনী।

রোমরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভলসীয়দিগের সহিত যুদ্ধ।

১। খ্রীঃ পূঃ ৪৯৭ অব্দে ভলসীয়দিগের সহিত রোমের তৃতীয় যুদ্ধ হয়।

২। ঐ জাতি বহুকালাবধি রোমানদিগের উপর অনেক অত্যাচার ও অনিষ্টাচরণ করাতে এই যুদ্ধ সংঘটন হয়।

৩। রোমনগর স্থাপনের ২৫৭ বৎসর পরে ইহার আরম্ভ হয় এবং রোমানেরা ইহাতে জয়ী হয়েন।

৪। এই যুদ্ধ প্রথমতঃ রোমের পক্ষে ভয়জনক হইয়াছিল। পরে কুইণ্টস সিন্সিনেটস নামে এক ব্যক্তি হলচালন করিতেছিলেন, রোমানেরা তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি দর্শন করিয়া তাঁহাকে (ক) ডিরেক্টর বা রোমের সর্ব্বাধ্যক্ষ করিল। এই ব্যক্তি যুদ্ধের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে এক মহাধনবান্ রোমান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র সিজোকে কোন গুরুতর দণ্ড হইতে রক্ষা করিতে তাঁহার সকল অর্থ নষ্ট হয়। ইহাঁর প্রথম বয়সের সাহসিক কার্য্য সকল দেখিয়া এই প্রয়োজনীয় ভার ইহাঁর উপর সমর্পিত হয়।

৫। যুদ্ধ সমাধা করিয়াই সিন্সিনেটস পুনর্ব্বার ভূমিকর্ষণ এবং ক্ষেত্রকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

৬। রোমানদিগের সহিত ভলসীয়দিগের আরও অনেক যুদ্ধ হয় এবং তন্মধ্যে কোরাইওলেনস (খ) নামে এক ভদ্রবংশীয় রোমান যুবক যে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া দেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ২৬২ রোমাব্দে বিচারকেরা তাঁহার কোন গুরুতর দোষ প্রমাণ করিয়া নির্ব্বাসনাজ্ঞা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ভলসীয়-

---

(ক) যখন রোমে ঘোর বিপদ উপস্থিত হইত অথবা কন্সলদিগের কথা কেহ অমান্য করিত অথবা অন্য কোন প্রয়োজন পড়িত, তখন সেনেটরেরা পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া কিছুকালের জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতেন; তাঁহাকে ডিরেক্টর বলিত।

(খ) প্রথমে ইহাঁর নাম ক্যায়স মার্সিয়াস্ ছিল। ভলসাইয়ের দুর্গ কোরাইওলি আক্রমণ করাতে তাঁহার নাম কোরাইওলেনস হইয়াছিল।

দিগের নিকট গমন করিলেন এবং উক্ত জাতির আশ্রয়ে স্বজাতীয় রোমানদিগের বিরুদ্ধে স্বয়ং সেনাপতি হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন।

৭। তিনি প্রতিবারেই জয়লাভ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ভয়ে সমুদায় রোমজনপদ থর থর কম্পমান হইল।

৮। কিন্তু তিনি তাঁহার অভিলাষ সিদ্ধ করিতে পারিলেন না। যখন রোমনগর আক্রমণার্থে তিনি তাহার সম্মুখে শিবির স্থাপন করিলেন, সেনেটরেরা আসন্ন ঘোর বিপদ দেখিয়া তদীয় ক্রোধশান্তির জন্য অনেক ভদ্র বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার মাতা ভিটুরিয়া ও পত্নী ভলম্নিয়াকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। তাঁহারা স্তুতি, মিনতি ও সাশ্রুনয়নে বারম্বার মাতৃভূমি রোমরক্ষা করিবার জন্য অনুনয় বিনয় করাতে নিষ্ঠুর কোরাইওলেনসের কঠিন হৃদয় আর্দ্র হইল এবং তখন তিনি স্বীয় দারুণ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া বাষ্পপূর্ণনেত্রে জননীকে বলিলেন, মাতঃ! তুমি রোমরক্ষা করিলে বটে, কিন্তু তোমার পুত্রকে পাইবার আর প্রত্যাশা করিও না।

পরে তিনি ২৬৬ রোমাব্দে সংগ্রাম হইতে ভল্সীয় সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। কিন্তু রোমলুণ্ঠনে নিরাশ হইয়া (৪৮৭ খৃঃ পূঃ) তাহারা তাঁহার প্রাণসংহার করিল। ইহাই তাঁহার বিদ্রোহজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

৯। ভল্সীয়ানেরা তথাপি যুদ্ধে নিরস্ত হয় নাই। কিন্তু কোরাইওলেনসের মৃত্যুর পর তাহাদিগের সকল চেষ্টাই বিফল হইল এবং অবশেষে তাহারা রোম সেনাপতি স্পিউরিয়স্ কেসিয়স্ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল।

১০। ইহার তিন বৎসর পরে স্পিউরিয়স্ দরিদ্রলোকদিগের উপর দয়ালু হইয়া প্রসিদ্ধ আগ্রেরিয়ান ল অর্থাৎ ভূমিসম্পর্কীয় আইন প্রস্তত করেন। ইহাতে সেনেটরেরা তাঁহাকে রাজত্ব-লাভাকাঙ্ক্ষা বলিয়া দোষী করেন এবং ২৬৮ রোমাব্দে (খৃঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দে) টার্পিয় পর্ব্বত (ক) হইতে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভিজেণ্টিদিগের সহিত যুদ্ধ।

১। খৃঃ পূঃ ৪০৪ অব্দে ভিজেণ্টিদিগের সহিত রোমানদিগের যুদ্ধারম্ভ হয়।

২। অনন্তর ৩৫৮ রোমাব্দে (খৃঃ পূঃ ৩৯৫ অব্দে রোমানেরা ডিরেক্টর কমিলসের অধীনে ক্রমাগত দশ বর্ষ (খ) আক্রমণের পর বিজেণ্টিনগর হস্তগত করেন।

৩। কামিলস্ এক মহাবীর ছিলেন।

(ক) কোন প্রধান ব্যক্তি দোষী প্রমাণ হইলে রোমানেরা তাঁহাকে টার্পিয় পর্ব্বত হইতে ফেলিয়া দিয়া বধ করিত।

(খ) ইতঃপূর্ব্বে রোমান সৈন্যগণ কয়েক মাস যুদ্ধবেশ পরিত্যাগ করিয়া ভূমিকর্ষণ করিত। কিন্তু এই ভিজেণ্টিদিগের সহিত যুদ্ধসময়ে সেনেটরেরা তাহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন এবং সম্বৎসর যুদ্ধ করিবার নিয়ম করিলেন।

তিনি ফাইডেণ্টেট্‌শ জাতি এবং কলশী নগর জয় করিয়া আপনার শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করেন এবং গলদিগের হস্ত হইতে রোমনগর রক্ষা করেন।

সপ্তম অধ্যায়।

গলিক যুদ্ধ।

১। ৩৬৩ রোমাব্দে গলদিগের সহিত রোমের প্রথম যুদ্ধ হয়।

২। গলেরা এই যুদ্ধের প্রবর্ত্তক। তাহারা লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া উত্তর দিক্ দিয়া ইটালীতে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের প্রত্যাশা ছিল যে, অনেক দ্রব্য লুণ্ঠন করিবে। তাহারা প্রথমে ক্লুসিয়ম্ (ক) আক্রমণ করিয়া পরে রোমের দিকে যাত্রা করিল।

৩। রোমানেরা যখন গলদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিল, তখন তাহারা অনেক সৈন্যের সহিত ফেরিয়স্ কন্সলকে যুদ্ধার্থে পাঠাইল।

৪। আলিয়া নদীর তীরে দুই দলে এক তুমুল সংগ্রাম হয়। তাহাতে রোমানদিগকে সম্পূর্ণরূপ পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

৫। জয় লাভ করিয়াই গল জাতি (খৃঃ পূঃ ৩৮৯) এককালে রোম নগরে প্রবেশ করিল। তাহারা লুটপাট আরম্ভ করিল। সেনেটরদিগের মধ্যে যাহাকে সম্মুখে পাইল, খড়্গাঘাতে তাহার প্রাণ সংহার করিল এবং সমুদায় নগরটী সমভূমি ও ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল।

৬। যুবক রোমানেরা মান্‌লিয়সের সহিত কাপিটল নামক সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গলাধিপতি ব্রেনস রাজধানী বিলুণ্ঠিত ও ভস্মসাৎ করিয়া অবশেষে সেই কাপিটলই আক্রমণ করিল।

৭। গলগণ ছয় মাস কাল কাপিটল অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল (খ)। পরে রোমানেরা নির্ব্বাসিত কামিলস্‌কে পুনরাহ্বান করিলে, তিনি অতি শীঘ্র নগর রক্ষার্থ ধাবমান হইলেন। তিনি পথিমধ্যে দুই সহস্র লোক সংগ্রহ করিয়া গলদিগকে পরাভূত ও রোম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। অনেক দূর পর্য্যন্ত তিনি তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং তাহাদিগের অধিকাংশকে কালকবলে প্রেরণ করিলেন।

৮। কামিলস জয়পতাকার সহিত রোমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তাহার ধ্বংসাবশেষ স্থানান্তরিত করিয়া এক নূতন নগর নির্ম্মাণের অনুমতি দিলেন। এই নূতন রোমনগর তাঁহার সাহায্যে নির্ম্মিত

(ক) টস্কানীর একটী নগর।

(খ) কথিত আছে, কোন রজনীতে রোমানেরা সকলেই নিদ্রিত ছিল, এমন সময়ে গলগণ এক অরক্ষিত গুপ্ত পথ দিয়া কাপিটল পর্ব্বতের উপর উঠিতেছিল। কিন্তু তাহাদের পদশব্দে জুনদেবীর হংসী সকল চীৎকার করিয়া উঠিল এবং তাহাতে সেনাপতি মান্‌লিয়স্ জাগ্রত হইয়া রোমানদিগকে রক্ষা ও গলদিগকে দূরীভূত করিলেন।

হওয়াতে তিনি "দ্বিতীয় রমুলস" বলিয়া খ্যাত হইলেন।

৯। ইহার অল্প কাল পরে মানলিয়স্ ও ডলাভেলা গলদিগকে ইটালীর সীমা হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলেই গলিক যুদ্ধের শেষ হইল।

ভিখারিণী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হেমচন্দ্র অতিশয় অনন্যমনা হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া তিনি অতি আগ্রহান্বিত হইয়া বলিলেন, "তার পর, তার পর?"

জীবনস্বামী উত্তর করিলেন, "তার পর আমি দেশে ফিরিয়া আসিয়া সকল বিষয় শুনিলাম এবং তাহার অনেক খোঁজ করিলাম, কিন্তু তাহাকে কোথায়ও পাইলাম না।"।

ইহার পর তাহাদের আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। হেমচন্দ্রের সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া ও উদারজনোচিত কথাবার্ত্তা শুনিয়া জীবনস্বামী তাঁহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। হেমচন্দ্র কমলিনীকে ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিলেন। তিনি বৃদ্ধের সহিত নিজের পিতার ন্যায় অনেক আলাপ করিলেন। বৃদ্ধও পুত্র সম্বোধনে হেমচন্দ্রকে পরিতুষ্ট করিলেন এবং নিজেও এই অসহায় অবস্থায় হেমচন্দ্রকে পুত্রের ন্যায় পাইয়া বড়ই সুখী হইলেন। হেমচন্দ্র দেখিলেন অধিক রাত্রি নাই। তিনি তখনই তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গন্তব্য পথাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সমস্ত পরিচ্ছদই ভিজিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সকলই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তিনি অনেকদূর অগ্রসর হইয়া একটী গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। অনর্গলাবদ্ধ দ্বার দেখিয়া হেমচন্দ্র বড়ই শঙ্কিত হইলেন এবং গৃহে প্রবেশ করিয়া কম্পিত স্বরে ডাকিলেন, "কুন্তল, কুন্তল,"—কাহারও সাড়া শব্দ নাই। প্রতিধ্বনি উত্তর করিল "কুন্তল, কুন্তল।" হেমচন্দ্রের প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তিনি কুসুম-নির্ম্মিতা প্রেমপুত্তলি কুন্তলকে গৃহে না দেখিয়া ভয়ানক বিপদাশঙ্কা করিলেন। তিনি ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, অনেক চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, কিন্তু তাহার কোন সাড়া পাইলেন না। আলো জ্বালিয়া তিনি দেখিলেন মূল্যবান্ জিনিষ একটীও ঘরে নাই। যে সকল জিনিষ আছে, সে সকলও এদিক ওদিক ছড়ান পড়িয়া আছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তবে কি তিনি পথিমধ্যে যে কাতর আর্ত্তনাদ শুনিয়া-

ছিলেন তাহা তাঁহারই কুন্তলের কণ্ঠ নিঃসৃত ? তবে কি কোন দস্যুদল তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গিয়াছে ? ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে গভীর নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিল, তিনি মাথায় হাত দিয়া এক স্থানে বসিয়া পড়িলেন। একটী গভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি আপনার মনে বলিয়া উঠিলেন, "তবে আমার কুন্তল অপহৃত হইয়াছে ?" কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিয়া তিনি উঠিলেন, আবার ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল দর্শিল না। ক্রমে শীতল-সৌরভ-সমীরণময়ী উষারাণী প্রেমময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, প্রভাতোদয়সূচক পক্ষিগণ মঙ্গলময়ী আরতি আরম্ভ করিল। বিধুপ্রিয়া কুমুদিনী নিশানাথের অন্তর্দ্ধানে বিষাদের নয়ন মুদিল। রজনী প্রভাত হইল. হেমচন্দ্র হতাশ হইয়া গৃহকোণে বসিয়া পড়িলেন। অমানুষিক অস্ফুট কাতর স্বরে তিনি আপনা আপনি বলিলেন, "তবে আমার দুঃখের নিমিত্ত কি প্রভাত হইল ?" তৎপর দিবস হেমচন্দ্র গ্রামের মধ্যে ও তাহার বাহিরে অনেক অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথায়ও কুন্তলের সন্ধান পাওয়া গেল না। হেমচন্দ্র শেষে নিরাশ হইয়া পল্লীর উদ্দেশে বাহির হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

হেমচন্দ্র পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় একটী যুবক। শৈশবকালেই তাঁহা। পিতৃ মাতৃ বিয়োগ হয়। তিনি একজন পিতৃবন্ধুর আশ্রয়ে লালিত পালিত হইয়া পরিশেষে তাঁহারই একমাত্র সন্তান কুন্তলের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। হেমচন্দ্র যেরূপ গুণবান্, দেখিতেও সেইরূপ রূপবান্ ছিলেন। আর কুন্তল ?, সেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ছিল। কুসুমময়ী কুন্তল রূপে গুণে অতুলনীয়া। তাহার গৌর মুখকান্তি সরল অথচ মধুর, তাহার অবেণীবদ্ধ আলুলায়িত ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত অলকদাম পৃষ্ঠোপরি বিষধর ফণীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত। তাহার প্রশস্ত উন্নত ললাট, আকর্ণবিস্ফারিত ভ্রমর পদভারস্পন্দিত নয়নযুগল, উষাকালীন মৃদু মলয়-মারুত-হিল্লোলিত কুসুমস্তর তুল্য ঈষৎ কম্পিত রক্তিম ওষ্ঠাধর, কৌমুদীস্নাত কুসুমস্তবকের ন্যায় উজ্জ্বল কপোলদ্বয় এবং তাহার সেই সর্ব্বাঙ্গীণ লাবণ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বোধ হয় যেন বিধাতার স্বহস্ততুলিকাসম্পাতেই এই অনিন্দ্য সুন্দরী বিশ্বমনোমোহিনী ছবিখানি চিত্রিত। আশৈশব তাঁহারা একত্র লালিত হওয়াতে তাঁহাদের প্রণয়-বন্ধন বড়ই মধুর হইয়াছিল। কালক্রমে কুন্তলের মাতাপিতাও সংসার হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। বলিতে গেলে সংসারে তাহাদের আপনার বলিবার কেহই রহিল না।

এক দিবস কোনও কার্য্যানুরোধে হেমচন্দ্র গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন। গৃহে

পত্নী একাকিনী রহিয়াছে মনে করিয়া তিনি প্রহরেক রাত্রিমধ্যে তথাকার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিলেন। পথিমধ্যে যাহা যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা পাঠকপাঠিকাগণ সকলই অবগত আছেন।

হেমচন্দ্র পত্নীর অন্বেষণে বাহির হইলেন। কিন্তু তিনি কোথায় যাইবেন? তিনি বুঝিতে পারিলেন না কোথায় গেলে পত্নীর সন্ধান পাইবেন! অনেক দেশ পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু কুন্তলের আর কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না।

ক্রমে কুন্তলের অনুসন্ধানে দুই বৎসর অতীত হইল। হেমচন্দ্র একেবারে হতাশ হইতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, "হায় কুন্তল! তুমি কি ইহ জগতে তবে নাই? একবার দেখিয়া যাও, তোমার হেমচন্দ্র আজ ধূল্যবলুণ্ঠিত ও স্বদেশত্যাগী! একবার দেখিয়া যাও, আমি কত কষ্টে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছি!" কেহ কোন উত্তর দিল না। কেবল একটী মর্ম্মস্পর্শী দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাহার অন্তস্তলস্থ গভীর শোকোচ্ছ্বাসের সহানুভূতি প্রকাশ করিল। সেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "হা ভগবন্! এই ত আবার সূর্য্য পশ্চিম আকাশের দিকে আসিতেছেন। এই ত তিমিরাচ্ছন্ন যামিনী আসিতেছে। অন্ধকারের পর আবার আলো আসিবে—আবার অন্ধকার আসিবে। পর্য্যায়ক্রমে একবার সূর্য্যদেব পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতেছেন, আবার পূর্ব্ব দিকে উদয় হইতেছেন। হে বিধাতঃ! কেবল এই অভাগার সুখ-সূর্য্য কি চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়াছে?"

হেমচন্দ্র কুন্তলের সেই অপরূপ রূপ-লাবণ্য-মণ্ডিত চম্পকচারু মূর্ত্তিখানি ও তাহার অনুপম গুণরাশির কথা ভাবিতে ভাবিতে একটী বৃক্ষের ছায়ায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন, সূর্য্য পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে ও পক্ষিগণ সন্ধ্যাকালীন আরতি গাহিয়া আপন আপন কুলায়ে আশ্রয় লইতেছে। চক্রবাক্ আপনার শেষগান গাহিয়া চক্রবাকীর সহিত প্রেমালাপ করিতে করিতে নীড়োদ্দেশে ধাবিত হইতেছে। নিরাশ্রয় পথিকগণ আশ্রয়াভিলাষে গ্রামাভিমুখে ছুটিতেছে। রাখালগণ 'গোঠ হতে আইল নন্দদুলাল আমার' বলিয়া মধুরতানে চারি দিক মাতাইয়া সদলে গৃহাভিমুখে ছুটিয়াছে। ভীমরূপিণী নিশার আগমনে জগৎস্থ সকলেই যেন ভীত, সকলেই আপন আপন আবাসস্থান খুঁজিয়া লইতেছে। কিন্তু আমাদের হেমচন্দ্র তখনও সেই প্রান্তরস্থিত বৃক্ষতলে উপবিষ্ট থাকিয়া আপনার অদৃষ্ট ভাবিতেছেন! তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "জগতে সকলেরইত একটী না একটী আশ্রয় আছে, আমার নাই কেন? সকলেরইত আশা আছে, আমার নাই কেন? হায় কে জানে এ নিরাশ জীবন আর কতকাল বহন করিতে হইবে!" এইরূপ ভাবিতে

ভাবিতে তিনি এতদূর চিন্তামগ্ন হইলেন যে,বাহ্য জগতের বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান রহিল না। এদিকে রজনী ক্রমেই অন্ধকারময়ী হইতে লাগিল, আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার চৈতন্য নাই, তিনি সেইরূপ ভাবেই চিন্তামগ্ন! এমন সময়ে তাঁহার মস্তকের উপর একটা পেচক গম্ভীর স্বরে ডাকিয়া উঠিল। পেচকের কর্কশস্বরে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি দেখিলেন রাত্রি অধিক হইয়া পড়িয়াছে, চারি দিকে শিবাগণ ভীষণ চীৎকার করিতেছে। তিনি তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিলেন। দুইটা শৃগাল তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতেছিল, তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া তাহারা বেগে পলায়ন করিল। হেমচন্দ্র কিয়ৎকাল কি ভাবিয়া আশ্রয়লাভের আশায় গ্রামাভিমুখে ধীরে ধীরে চলিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

গিলিয়ান সিটনের উত্তরাধিকারিত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্যারণসকম্ব পল্লীটি বেশ নির্জ্জন ও হরিতবর্ণ উপবনাকীর্ণ। চারি দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়। নির্ঝরিণী ও সুদূরবিস্তৃত শ্যামল প্রান্তরে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর-রাজিতে স্থানটি গল্পে লিখিত পরীর রাজ্যের ন্যায় মনোরম। এই সুন্দর স্থানটির মধ্যে নানা প্রকার কারুকার্য্যখোদিত প্রকাণ্ড ব্যারণসকম্ব প্রাসাদটি পরী রাণীর প্রাসাদের ন্যায় প্রথম দর্শনেই দর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিত। এই প্রকাণ্ড প্রাসাদের বর্ত্তমান অধিকারিণী গিলিয়ান সিটন সম্প্রতি তাঁহার সখী মেরিয়নের সহিত এই প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। এই প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত বিপুল ব্যারণসকম্ব জমীদারীর তিনি এক্ষণে একমাত্র কর্ত্রী ও স্বত্বাধিকারিণী। কিন্তু তিনি এত বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেও তাঁহার মনে কিছুমাত্র সুখ ছিল না। ব্যারণসকম্ব জমীদারীর অধিবাসী প্রজাবর্গের অন্তরে এই অকস্মাৎ আবির্ভূত নূতন ভূমধিকারিণীর প্রতি যে একটা আন্তরিক ঘৃণাভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, সে সংবাদ গিলিয়ানের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। এই কারণেই গিলিয়ানের অন্তরে কিছুমাত্র সুখ ছিল না।

আজ ব্যারণসকম্ব পল্লীটি পরিষ্কার ও নির্ম্মল প্রভাতালোকে দীপ্ত ও সমুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। গ্রীষ্মের প্রথম আবির্ভাবে চারি দিক বেশ একটু উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গিলিয়ান ও মেরিয়ন এই সুন্দর প্রভাতকালে ব্যারণসকম্ব প্রাসাদের

বসিবার গৃহে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। মেরিয়ণ সম্প্রতি কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। তাহার আনন হইতে বিগত অসুস্থতার ম্লান ছায়া তখনও অপগত হয় নাই। গিলিয়ানের যত্নে ও শুশ্রূষায় সেই কঠিন পীড়ার সময়ও তাহাকে কোন প্রকার অভাব অনুভব করিতে হয় নাই। পীড়া হইতে মুক্ত হইলেও গিলিয়ানের একান্ত অনুরোধে মেরিয়ণ ব্যারন্সকম্ব প্রাসাদে এতাবৎকাল বাস করিতেছিল। আজ প্রভাতে মেরিয়ণ তাহার বন্ধু মিসেস গোল্ডস্মিথের নিকট হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই পত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়া মেরিয়ণ সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতাসূচক স্বরে বলিল—গিলিয়ান! মিসেস গোল্ডস্মিথ আমার জন্য কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার সহকারীর কার্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং এই সপ্তাহের মধ্যেই আমাকে কার্য্য গ্রহণ করিতে লিখিয়াছেন। দেখিতেছি, মিসেস গোল্ডস্মিথের আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ

গিলিয়ান মেরিয়ণের কথার উত্তরে ঈষৎ অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে বলিলেন—

হাঁ হাঁ! মিসেস গোল্ডস্মিথের তোমার প্রতি যে যথেষ্ট অনুগ্রহ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই সত্য। কিন্তু আমার তাঁহার উপর অত্যন্ত রাগ হইতেছে। তুমিত জান যে, এখানে আমার নিকটে তোমাকে চিরদিন রাখিবার জন্য আমার কি পর্য্যন্ত না আগ্রহ। কিন্তু দেখ, তুমি চলিয়া যাইবে ইহা মনে করিয়া তুমি কি পর্য্যন্ত না আনন্দিত হইতেছ।

মেরিয়ণ দুঃখিত স্বরে উত্তর করিল—

আমি আমার সখীর এই সুন্দর সুখময় গৃহ পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছি ইহা মনে করিতে আমার কষ্ট হইতেছে। কিন্তু আমি এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমি কাহারও ভার স্বরূপ হইয়া জীবন যাপন করিতে চাই না। আমি স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনের বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

গিলিয়ান বলিলেন—"মেরিয়ণ, তুমি পূর্ব্বের কথা সমস্ত ভুলিয়া যাইতেছ। পূর্ব্বে তুমি আমাকে কোন্ বিষয়ে না সাহায্য করিয়াছ? কতদিন তুমি তোমার স্বকীয় উপার্জ্জনে আমাকে সুন্দর পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া দিয়া নিজে সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দারুণ শীতের দিন যাপন করিয়াছ। আরও—" মেরিয়ণ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল—"কিন্তু তুমি আমাকে আমার সে সমস্ত সামান্য উপকারের কত অত্যধিক পরিমাণে প্রতিদান করিয়াছ তাহা আমি ভুলিতে পারিব না। স্মরণ করিয়া দেখ, আমার দীর্ঘকালীন কঠিন পীড়ার সময়ে তুমি আমার কত যত্ন, কত শুশ্রূষা করিয়াছ। আর এই সুন্দর প্রাসাদে যে নিজ গৃহের ন্যায় সুখে ও সচ্ছন্দে বাস করিতেছি, তাহা তোমার অকৃত্রিম স্নেহের নিদর্শন, ইহা জানিয়া কেমন করিয়া এ সমস্ত ভুলিব। সত্য, সময়ে সময়ে আমার মনে হয় যে,

আমিই এই সুন্দর প্রাসাদের অধিকারিণী, তুমি নহ।"

মেরিয়ণের এই কথাতে গিলিয়ান সহসা তীব্র আবেগভরে বলিলেন—আমারও সময়ে সময়ে মনে হয় যে, আমি যেন এই ব্যারন্সকম্ব প্রাসাদের অধিকারিণী নহি। হায়! আমি যদি ইহা কখন না দেখিতাম, তাহা হইলে ভালই হইত।

মেরিয়ণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—প্রিয় জিল! কেন এ কথা বলিতেছ?

গিলিয়ান অশ্রুপূর্ণ স্বরে বলিলেন—এক-জন অনধিকারী ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার প্রাপ্ত হওয়া যে কি কষ্টকর তাহা তুমি জান না। তুমি দেখিতে পাইতেছ যে, ব্যারন্সকম্ব জমিদারির প্রজাবর্গ সকলের মনে এই ভাব মুদ্রিত রহিয়াছে যে, আমি ব্যারন্সকম্ব জমিদারির যথার্থ অধিকারী মিষ্টার এলান থরণসবাইয়ের নিকট হইতে প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক এই সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছি। মিস লেথাম আমার কুহকে পড়িয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি মিষ্টার থরণসবাইকে দান না করিয়া উইল দ্বারা আমাকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমার মাতার মৃত্যুর পর মিস লেথামকে আমি একটি বার মাত্র দেখিয়াছিলাম। ছলনাপূর্ব্বক তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দান করিতে তাঁহাকে বাধ্য করা আমার ন্যায় অল্পবয়স্কা রমণীর পক্ষে কিরূপ অসম্ভব, তাহা তাহাদের বুঝাইয়া বলিলেও তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না।

মেরিয়ণ বলিল—কিন্তু আমার এই মত যে, মিস লেথাম তাঁহার সম্পত্তি যাহাকে ইচ্ছা দান করিতে পারেন, তাহা লইয়া লোকের সমালোচনা করা অন্যায়। আমি যদি তোমার স্থলাভিষিক্ত হইতাম, তাহা হইলে ইহার জন্য বিন্দুমাত্র ব্যথিত হইতাম না। ইহা ব্যতীত আমার বিশ্বাস যে, তুমি যা মনে করিতেছ সেরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই। তুমি এইমাত্র না এলান থরণসবাইয়ের নাম করিলে? আমি নর্টন হলের মিষ্টার এলান থরণসবাইয়ের পিতামহীর সহচরীর কার্য্য গ্রহণ করিতে যাইতেছি। আমার বোধ হয় তোমার উল্লিখিত এই মিষ্টার থরণসবাই ও আমার নিয়োগকর্ত্তা নর্টন হলের থরণসবাই একই ব্যক্তি।

গিলিয়ান বিস্মিত হইয়া বলিলেন—নর্টন হলের এলান থরণসবাই? আমি এঁদের কথাই বলিতেছি। পূর্ব্বে এঁরাই ডান্সবারর জমিদারির অধিকারী ছিলেন। ঋণে জড়িত হইয়া ইহাঁরা ডান্সবারর জমি-দারির অধিকারচ্যুত হয়েন। এক্ষণে এই নর্টন হলের সামান্য জমিদারি ব্যতীত ইহাঁদের আর কোন সম্পত্তি নাই। এলান থরণসবাই তাঁহার পিতামহীর সঙ্গে এই নর্টন হলেই বাস করেন। লোকে বলে যে, তিনি তাঁহার জমিদারিতে এক-জন সামান্য চাষার ন্যায় কর্ম্ম করেন।

মেরিয়ণ বলিল—তবে লোকে কেন বলিয়া থাকে যে, মিস লেথামের ব্যারন্স-কম্ব জমিদারির তিনিই ন্যায্য অধিকারী। তাঁহাকেই এই জমিদারি মিস লেথামের

দান করিয়া যাওয়া উচিত ছিল। না দিবার কারণ কি তাহা আমিও বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি তাহা তুমি কখন আমাকে বুঝাইয়া বল নাই।

গিলিয়ান বলিলেন—মেরিয়ণ! সত্যই কি আমি কখন ইহার কারণ তোমাকে বলি নাই? মিষ্টার এলান থরণসবাই মিস লেথামের একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি রীতিমত ইহাঁকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহাঁকেই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মিস লেথাম তাঁহার এই ভ্রাতুষ্পুত্রকে বড়ই ভাল বাসিতেন, কিন্তু যখন মিষ্টার থরণসবাই লর্ড আরমিডেলের জ্যেষ্ঠ কন্যা লেডি আরমিডেলকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করেন, তখনই মিস লেথামের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। মিস লেথাম লেডি আরমিডেলকে আদৌ দেখিতে পারিতেন না। লেডি আরমিডেলের প্রতি মিস লেথামের বিদ্বেষ ব্যতীত বিবাহের আর কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। মিষ্টার থরণসবাই তাঁহার পিতৃস্বসার এই প্রতিবন্ধকতাচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত কলহ করেন। এই কলহের ফলে রাগের মাথায় মিস লেথাম তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া আমাকেই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিয়া যান। কিন্তু সকলেই মনে করিয়াছিল যে, শেষকালে তিনি মিষ্টার থরণসবাইকেই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যাইবেন। ইহার কারণ এই যে, সম্প্রতি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি তাঁহার ক্রোধ অনেকটা সাম্যভাব ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতেই তাঁহার উইল পরিবর্ত্তন করিবার অবসর হয় নাই।

মেরিয়ণ বলিল—এখন আমি সমস্ত বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু জিল! যখন তুমি এত ধনের অধিকারিণী হইয়াছ, তখন এরূপ অবস্থাতে মিষ্টার থরণসবাইয়ের সহিত তোমার জমিদারির বাৎসরিক আয়টা ভাগাভাগি করিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে কি?

গিলিয়ান বলিলেন—তুমি কি মনে কর মিষ্টার থরণসবাইয়ের নিকট আমি এ প্রস্তাব করি নাই? আমি তাঁহার নিকট এ প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি উকিলের দ্বারা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

মেরিয়ণ বলিল—বেশ, তবে তোমাকে এজন্য কেহ দোষ দিবে না। তুমি আশার অতীত করিয়াছ, এখন সমস্ত দুঃখ ও সন্তাপ তোমার মন হইতে দূর করিয়া দাও।

গিলিয়ান বিষন্ন ভাবে বলিলেন—আমি আমার মন হইতে ইহা দূর করিতে পারিব না। অন্যের সম্পত্তি অপহারকের ন্যায় ব্যবহার প্রাপ্ত হওয়া যে কি কষ্টকর, তাহা তোমার কল্পনার অতীত, কিন্তু মেরিয়ণ! যদি তুমি নর্টন হলের কার্য্য গ্রহণ কর, তাহা হইলে হয়ত তুমি সে কাজটা সিদ্ধ করিতে পারিবে। ওঃ! না না, আমিই নিজে—

মেরিয়ণ বলিল—ব্যাপার কি ?

গিলিয়ান বলিলেন—কেন, তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না ? আমার মনে হইল যে, ইহা সৌভাগ্যের সঞ্চার। তুমি যে নর্টন হলের কার্য্য গ্রহণ করিতেছ, তাহা তাহাদিগকে লিখিয়া দাও। কিন্তু ডাক্তার তোমাকে শীতকালটা বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্ম বিয়ারিটজে বাস করিতে বলিয়াছেন, তুমি সেখানেই চলিয়া যাও। আমি তোমার "মেরিয়ণ এডামস" এই নাম গ্রহণ করিয়া নর্টন হলে চলিয়া যাই। গিলিয়ান যেন কোন একটা অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন এই ভাবে শেষের কথাগুলি বলিয়া সহসা নীরব হইলেন। মেরিয়ণ বিস্মিত হইয়া বলিল—গিলিয়ান এমন কথা বলিতেছ কেন ? তুমি কি সহসা পাগল হইলে ?

গিলিয়ান তাহার সখীর আসনের উপর হস্ত রাখিয়া বলিলেন—না না, আমি পাগল হই নাই। আমিই নর্টন হলে স্বয়ং যাইব। আমি কে তাহা জানিবার পূর্ব্বেই আমি তাহাদিগকে আমাকে ভাল বাসিতে বাধ্য করিব। তাহার পরে সমস্ত সহজ হইয়া উঠিবে।

মেরিয়ণ বলিল—হাঁ ! তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ সহজ হইতে পারে সত্য, কিন্তু আমি এরূপ বাতুলের কার্য্যে যোগ দিতে সম্মত হইতে পারি না।

গিলিয়ান বলিলেন—তুমি অবশ্য সম্মত হইবে। ওঃ! মেরিয়ণ, মেরিয়ণ, আমার জন্য সম্মত হও। যে পর্য্যন্ত না এলান থরণসবাইয়ের সঙ্গে ব্যারন্সকম্ব সম্পত্তি সম্বন্ধে একটা কোন মিটমাট না করিতে পারি, সে পর্য্যন্ত আমার মন শান্তি পাইবে না। এই ব্যারন্সকম্ব জমিদারির উত্তরাধিকারিত্ব ব্যাপারটাই কেবল দুই জন প্রণয়ীকে পৃথক করিয়া রাখিতেছে। কারণ যে পর্য্যন্ত না মিষ্টার থরণসবাই ব্যারন্সকম্ব জমিদারির অধিকার প্রাপ্ত হইতেছেন, সে পর্য্যন্ত লর্ড আরমিডেল তাঁহার কন্যার সহিত থরণসবাইয়ের ন্যায় অবস্থাসম্পন্ন লোকের বিবাহ দিতে সম্মত হইবেন না। লেডি আরমিডেল খুব সুন্দরী রমণী। তুমি যদি তাঁহাকে দেখিতে এবং বুঝিতে যে, তাঁহাকে সুখী করা তোমারই ক্ষমতাধীন, তাহা হইলে আমি যাহা তোমাকে করিতে অনুরোধ করিতেছি তাহা করিতে তুমি নিশ্চয়ই সম্মত হইতে। অঙ্গীকার কর মেরিয়ণ, অঙ্গীকার কর।

মেরিয়ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞাসূচক স্বরে উত্তর করিল—ইহাতে কি যে মঙ্গল উৎপাদিত হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যখন মিষ্টার থরণসবাই তোমার অধিকৃত সম্পত্তি গ্রহণ করিতে একেবারে অস্বীকার করিতেছেন, তুমি সেখানে গিয়া প্রস্তাব করিলে তিনি আরও দৃঢ়রূপে অস্বীকৃত হইবেন।

গিলিয়ান আনন্দপূর্ণ স্বরে বলিলেন—আমি সেখানে যাইব। বেশ, মেরিয়ণ বেশ। তবে তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও।

মেরিয়ণ বলিল—যদি তুমি অকৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে কি হইবে?

গিলিয়ান বলিলেন, আমি কখনও অকৃতকার্য্য হইব না।

মেরিয়ণ বলিল-যাহা তোমার ইচ্ছা হয় কর। কিন্তু প্রস্তাবটা আমার কিছুতেই মনে ধরিতেছে না। কেমন করিয়া তুমি এ কাজটা সম্পাদন করিবে?

লজ্জাবতী।

বৃন্দাবন-দৃশ্য।

গত বুধবার বেলা ১০টা ১০ মিনিটের ট্রেণে রাজাকীসত্তী ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া বেলা প্রায় ১২॥ টার সময় আমরা মথুরা জংশন ষ্টেশনে নামিলাম। মথুরা জংশন ষ্টেশনটী বেশী বড় না হইলেও নিতান্ত ছোট নহে। সেখানে দুইখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা হইল। ষ্টেশনে ট্রেন আসার সময় পাণ্ডা বা ব্রজবাসিগণ যাত্রীদিগের অপেক্ষায় থাকে, এবং যাত্রীরা নামিলেই "তোমার বাড়ী কোন্ জেলায়, তোমার নাম কি" ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে ও নূতন যাত্রী হইলে তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলে। আমাদের পুরাতন পাণ্ডা "দাঁতভাঙ্গা প্রহ্লাদ"। শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাদের কোন পূর্ব্বপুরুষের দ্বন্দ্বযুদ্ধে দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাই পুরুষানুক্রমে ইহারা 'দাঁতভাঙ্গা' নামে বিখ্যাত। যাহা হউক, আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত পাণ্ডাজী থাকায় আমাদিগকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। আমাদের গাড়ী একেবারে স্বামী-ঘাটের উপর হরমুখরায় দুলীচন্দ্রের ধর্ম্মশালার সম্মুখে থামিল। আমরা সেই ধর্ম্মশালায় নামিলাম ও এক ধারে দুইখানি ঘর পাইলাম। ধর্ম্মশালাতে যে এরূপ সুন্দর বন্দোবস্ত, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। আরও দুই তিন দল যাত্রী সেই বাড়ীতে ছিলেন, কিন্তু তাহাতে আমাদের কোনও অসুবিধা হয় নাই, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন সংশ্রব ছিল না। 'পাইখানা' ইত্যাদির বন্দোবস্তও অতি সুন্দর, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। রাত্রিতে ধর্ম্মশালার ফটক বন্ধ থাকিত ও ভোরে খুলিয়া দেওয়া হইত এবং পূর্ব্বে যাত্রীদিগকে সাবধান করিবার জন্য বলিয়া দেওয়া হইত "ফটক খোলা হইতেছে, তোমাদের জিনিষ সাবধানে রাখিও।" ধর্ম্মশালার অবারিত দ্বার, সেজন্য তথাকার যাত্রীদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইত। ধর্ম্মশালার রক্ষণাবেক্ষণের ভার যাঁহার উপর, তিনিও অতি ভদ্র লোক। পরের উপকারের জন্য যাঁহারা ধর্ম্মশালা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে

দীর্ঘায়ু করুন, তাঁহারা জগতের পরম হিতৈষী। আমরা সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বেলা তিনটার সময় যমুনার তীরে গেলাম। ঘরের ভিতর হইতেই যমুনা দেখা যাইত। সেখানে গিয়া দেখিলাম, ঘাটে অনেকগুলি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া আমাদের নৌকা চড়িতে সাধ হইল এবং তখনি একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া খানিকটা বেড়াইয়া আসিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা দর্শনে বাহির হইলাম এবং দ্বারকানাথ ও মথুরানাথ দর্শন করিয়া বিশ্রামঘাটে উপস্থিত হইলাম। তখন আরতির সময়, ঘাটের উপর জনতা অধিক, সেইজন্য আমরা একখানি নৌকা ভাড়া করিলাম এবং নৌকার উপর হইতে বিশ্রামঘাটের আরতি দেখিলাম। সে সময়ের দৃশ্য অতি সুন্দর, শঙ্খ, ঘণ্টার ধ্বনি এবং আরতি-প্রদীপের স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল প্রভায় হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। সেই সময় চারি দিক হইতে দর্শকেরা ফুলের মালা আরতি-প্রদীপের উপর ছুড়িয়া ফেলিতে থাকে, সে দৃশ্যও অতি মনোহর। সে সময় শত সহস্র কচ্ছপ বিশ্রামঘাটে জলের উপর ভাসিয়া উঠে ও সিঁড়ির উপর পর্য্যন্ত ঘিরিয়া ফেলে। যাত্রীরা সে সময় তাহাদিগকে ছোলা-ভাজা খাইতে দেন এবং অনেকে ঘৃতের প্রদীপ জালিয়া কচ্ছপের পিঠের উপর রাখিয়া দেন। পাণ্ডাজী বলিলেন "আপনাপন কুল উজ্জ্বল করিবার কামনায় যাত্রীরা গঙ্গার বক্ষে এইরূপে প্রদীপ ভাসাইয়া দেন"। কচ্ছপগুলি যে সময় জলের উপর ভাসিয়া যায়, তখন অন্ধকার রাত্রিতে নক্ষত্রের মত প্রদীপগুলি জ্বলিতে থাকে।

আমরা আরতি দর্শন করিয়া নৌকাতেই স্বামী-ঘাট পর্য্যন্ত আসিলাম ও তৎপরে বাসায় ফিরিলাম। রাত্রিতে দোকানের খাবার আনাইয়া সকলে আহার করিলাম। পরদিন বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৬টার মধ্যে আমরা সকলে হাত মুখ ধুইয়া প্রস্তুত হইলাম। ঘোড়ার গাড়ী আগের দিন ঠিক করা ছিল, ৬টায় আসিবে। কিন্তু ৭টার সময় গাড়ী আসিল, তখন আমরা রাধাকুণ্ডে যাত্রা করিলাম। পথের মধ্যে প্রথমেই ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মহাদেবের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। সেই মন্দিরের এক পার্শ্বে সিঁড়ি দিয়া খানিকটা নীচে নামিলে অন্ধকারের মধ্যে মাহেশ্বরী বা পাতালেশ্বরী দেবীর দর্শন হয়। ভগবতীর ৫১ পীঠের এক পীঠস্থান এই দেবী প্রতিমা, সেজন্য এই দেবীর মাহাত্ম্য অধিক। মাহেশ্বরী দেবী দেখিতে মন্দ নহেন। তাহার কিছু দূরে শান্তনুকুণ্ড। কুণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে মন্দির। চারি দিকে জল ও মধ্যে মন্দির দেখিতে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকারী। জলের উপর সাঁকো, সেই সাঁকোর উপর দিয়া মন্দিরে যাইতে হয় এবং প্রায় নব্বইটা সিঁড়ির উপর দিয়া গিয়া উপরে "শান্তনু-বিহারী" প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন, গঙ্গার তিরোভাবের পর শান্তনু রাজা গঙ্গার দর্শনের কামনায় এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাই ইহার নাম

শান্তনুকুণ্ড এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নাম শান্তনুবিহারী। আরও কিছু দূর গিয়া গোবর্দ্ধন পাহাড়। পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে, এখানে উচ্চ উচ্চ পাহাড় দেখিতে পাইব। কিন্তু সেরূপ কিছু নাই, নীচু নীচু মাটীর ঢিপির উপর ছোট বড় সকল প্রকার পাথর দিয়া মাটীগুলি যেন ঢাকা রহিয়াছে। শুনিলাম, গোবর্দ্ধনধারণের পর উহা নামাইবার সময় কৃষ্ণের হস্তস্খলিত হইয়া পড়িয়া গিয়া ঐরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই পাথরের ঢিপির মধ্যে কুমানস গঙ্গা প্রায় দুই ক্রোশব্যাপী, তাহার নিকটেই মন্দিরে কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিলাম। আরও কিছু দূর গিয়া কুসুম সরোবর দেখিতে পাইলাম। সরোবরের জলও সুস্বাদু। সরোবরের উপর একটী বাগান-বাটী আছে, তাহাতে ভরতপুরের রাজার সমাধি, নিকটে একটী মন্দির ও তাহাতে উদ্ধবের মূর্ত্তি রহিয়াছে। অবশেষে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ডের দর্শন পাইলাম। সে দুটী পাশাপাশি, অনেক যাত্রী সেখানে স্নান করিতেছিলেন। অগ্রে রাধাকুণ্ডে স্নান করিয়া পরে শ্যামকুণ্ডে স্নান করিতে হয়। কুণ্ডের জল তেমন পরিষ্কার নহে, সেজন্য আমাদের সেখানে স্নান করিবার তেমন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ সেখানে আমাদের জনৈক আত্মীয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং তাঁহার অনুরোধে আমরা রাধাকুণ্ডে স্নান করিলাম এবং নিকটেই দুই তিন স্থানে ঠাকুর দর্শন করিলাম। তখন বেলা ১টা, সেখানেই বাজারে ঠাকুরের ভোগের জন্য মালপুয়া ভাজিতেছিল, আমরা তাহাই ক্রয় করিয়া জলযোগ করিলাম। আমাদের সেই আত্মীয়টি আরও কিছুক্ষণ সেখানে থাকিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, "কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, ছেলেদের অন্ন রাঁধিয়া দিতেছি"। কিন্তু নির্জ্জন পথে ফিরিতে রাত্রি হইলে চোর ডাকাইতের ভয়, সেইজন্য সেখানে আর অপেক্ষা না করিয়া ফিরিলাম এবং অপরাহ্নে পাঁচটার পর বাসায় পৌঁছিলাম। সকলেই ক্লান্ত, সেইজন্য রান্নার হাঙ্গাম না করিয়া বাজারের লুচি ও মিষ্টান্ন সকলে আহার করিলাম। সে দিন সন্ধ্যাবেলা আমরা আর বাহির হইলাম না। পরদিন "শুক্রবার" প্রাতে নৌকা করিয়া আমরা ধ্রুবঘাট পর্য্যন্ত গেলাম। ধ্রুবঘাটের নিকটে একটী মন্দিরে বালক ধ্রুবমূর্ত্তি, সেখান হইতে কিছু দূরে মধুবন, শুনা যায় সেখানে ধ্রুব তপস্যা করিয়াছিলেন। ধ্রুবঘাট হইতে আধ ক্রোশ গিয়া কংসলীলা দেখিলাম। এখানে কৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়াছিলেন, এইজন্য এখানে কংস ও কৃষ্ণ-বলরামের মূর্ত্তি রহিয়াছে। উহা দেখিয়া আমরা আবার ধ্রুবঘাটে ফিরিয়া আসিলাম। ঘাটের ধারেই একটী ছোট দালান ছিল, উহাতে আমাদের খেচোড়ান্ন প্রস্তুত হইল। আহারান্তে দুইখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া বাসায় আসিয়া বিছানা ইত্যাদি লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলাম। এখানে মথুরার পাণ্ডা দাঁতভাঙ্গা প্রহ্লাদ

বিদায় লইলেন। এই পাণ্ডাটি বেশ ভাল লোক, আমাদের ভাল করিয়া দর্শন করাইয়াছিলেন এবং পাওনার জন্য কোনও উপদ্রব করেন নাই, যাহা দেওয়া হইল, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। তবে সকল স্থানেই 'এখানে দান করিতে হয়', "এখানে সংকল্প করিতে হয়" ইহা পাণ্ডাদের বুলি, কারণ সেগুলি তাঁহাদের প্রাপ্য। সকলেই তীর্থস্থানে সাধ্যমত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তবে অনেক পাণ্ডা যাত্রীদের সাধ্যাতীত ব্যয় করাইবার জন্য জুলুম করিয়া থাকে। আমরা নিরাপদে শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিলাম। সেখানকার পুরাতন পাণ্ডা রামপ্রসাদের খোঁজ করা হইল। শুনিলাম তাঁহার বৃন্দাবনপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাঁহার পুত্র বালক, সেজন্য রামপ্রসাদের ভাই রামজীবন তাহাদের অবিভাবক স্বরূপ সেখানে থাকেন ও তিনিই আমাদের পাণ্ডা হইলেন। পাণ্ডাজী আমাদের তিন চারিটা বাসা দেখাইলেন, কিন্তু সকলগুলিই অপরিচ্ছন্ন, ক্ষুদ্র ও সঁ্যাৎসেঁতে, সেরূপ স্থানে ছেলেদিগকে লইয়া থাকা অসম্ভব, অগত্যা এখানেও আমরা তিলকচন্দ্রের ধর্ম্মশালায় গেলাম। আমরা এখানে দুইখানি ঘর পাইলাম, এখানকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার যাঁহার উপর, তিনিও অতি ভদ্র লোক। এখানে আর কোন অসুবিধা ছিল না, কেবল পাইখানার অত্যন্ত অসুবিধা, হরিদ্বারের জম্বুরাজার ধর্ম্মশালার ন্যায় ছাদের উপর দুটী পাইখানা। অবশ্য তাহাতে খুব অসুবিধা। তবে দুই এক দিনের জন্য সেখানে থাকা এবং অন্য সকল সুবিধা ছিল বলিয়া উহাই আমরা মনোনীত করিলাম। অপরাহ্ণ ৪ টার সময় বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া দর্শনে বাহির হইলাম ও শ্রীগোপীনাথ, রাধা-দামোদর, রাধারমণ, পৌর্ণমাসী এবং গোবিন্দ দর্শন করিয়া বাসায় আসিলাম। পরদিন শনিবার প্রাতে 'শাহজী'র মন্দির, গোপীশ্বর মহাদেব, ব্রহ্মকুণ্ড, চৌষট্টী মহান্তের সমাজ, নিকুঞ্জবন ও নিধুবন দর্শন করিয়া 'শেঠে'র মন্দিরে গেলাম। তখন বেলা ১১টা হইবে, সেখানে গিয়া শুনিলাম, তখন ভিতরে প্রবেশ নিষেধ, কারণ সে সময় ঠাকুর বাহির হইতেছিলেন। দোল পূর্ণিমার পর কৃষ্ণা দ্বিতীয়া হইতে ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত শেঠের বাড়ীতে শ্রীরঙ্গনাথ জিউর "ব্রহ্মোৎসব" নামক একটি উৎসব হইয়া থাকে, স্থানীয় লোক ইহাকে "শেঠের মেলা" বলে। পূর্ব্বাহ্নে ও রাত্রিতে নানা প্রকার যান বাহনে আরোহণপূর্ব্বক মন্দির হইতে ঠাকুর নিজ বাগানে গিয়া থাকেন। এই উপলক্ষে মন্দিরের প্রথম প্রাচীরের বাহিরে এবং মন্দিরের বহির্দ্বার হইতে বাগান পর্য্যন্ত রাজপথের দুই ধারে "সদাগরী মণিহারী", মিষ্টান্ন, খেলানা, বাসন, কাপড় প্রভৃতি নানা প্রকারের দোকান সাজান থাকে। এই বার দিন উৎসবের মধ্যে পঞ্চমী ও দশমী তিথিতে বাগানের নিকট ঠাকুরের সম্মুখে সহস্রাধিক

টাকার বাজী পোড়ান হয়। এই মহোৎসবে প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। এই কয় দিন প্রত্যহ শত সহস্র কাঙ্গালী ভোজনও হয়। ইহাকেই বলে অর্থের সদ্ব্যবহার। ধন্য শেঠ লক্ষ্মীচন্দ্র!! তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি যুগে যুগে অমরত্ব লাভ করিয়া, তোমার নাম জগতে অমর করিয়া রাখুক। আমরা ঠাকুর দর্শন করিবার জন্য মন্দিরের এক পার্শ্বে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আধ ঘণ্টা পরেই সানাই বাজিয়া উঠিল, সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং সকলেই উৎসুক নেত্রে মন্দিরের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রথমে একটা সাজান হাতী, দুটী উট, ৮।১০ টী ঘোড়া বাহির হইল। তাহার পর চারি জন লোকের হাতে (রঙ্গিন পতাকার ন্যায়) শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম, প্রায় পঞ্চাশ জন লোকের হাতে পতাকা ও কাঁধে বন্দুক, এইরূপে একে একে সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাহির হইতে লাগিল, মধ্যে দুই দল ইংরাজী বাদ্য ছিল। অবশেষে রঙ্গ দেব জিউ বাহিরে আসিলেন; ৬০ জন বেহারা বৃহৎ কাষ্ঠমঞ্চ স্কন্ধে লইয়া বাহির হইল; সেই কাষ্ঠমঞ্চের উপর বৃহৎ গরুড়মূর্ত্তি ও তাহার উপর ঠাকুর বসিয়া আছেন। সে সময়ের বাহ্যিক দৃশ্য অতি সুন্দর, শত শত লোকের দৃষ্টি আর কোন দিকে নাই, সকলেই ঠাকুরের মুখ পানে চাহিয়া আছে। ঠাকুর নিজের বাগানের দিকে গেলেন, দর্শকবৃন্দও সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকে ছুটিল। তখন বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে, আমাদের সঙ্গে ছোট ছেলে ছিল, সেই জন্য আর বিলম্ব না করিয়া বাসায় প্রত্যাগমনানন্তর রন্ধনাদি করিয়া আহার কার্য্য সমাধা করা হইল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বৈকালে পাঁচটার সময় আমাদের পাণ্ডাজী আসিলে দর্শনে বাহির হইয়া শ্রীমদনমোহন ঠাকুরের মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের বাহিরে, সিঁড়িতে নিজেই আমাদের জেটতুতো ভাই স্বর্গীয় অনন্ত মোহন বাগচীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ইংরাজীতে তাহার স্বহস্তে লিখিত এ, এম বাগচী নাম খোদা শ্বেত প্রস্তরখানি বসান রহিয়াছে দেখিলাম। স্বর্গীয় সেজ জাটা মহাশয় তাঁহার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র-বিয়োগের পর পুত্রের নামাঙ্কিত প্রস্তরখানি মদনমোহনের চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই প্রস্তরখণ্ড দর্শনে পুরাতন স্মৃতি সকল জাগিয়া উঠিল এবং হৃদয় আকুল হইল। "মদনমোহন স্বর্গীয় দেবতাদিগকে চরণে আশ্রয় দিও।" এইরূপ আরও কত লোকের নামাঙ্কিত প্রস্তরখণ্ড সকল, প্রত্যেক মন্দিরের স্থানে স্থানে বসান রহিয়াছে। মদনমোহন ও কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির দেখিয়া সন্ধ্যার সময় শ্রীগোবিন্দ জীর মন্দিরে পৌঁছিলাম, এবং সেখানকার মঙ্গল আরতি দেখিলাম! ভগবানের কি মহিমা! আমাদের ন্যায় সংসারীর হৃদয়েও তাঁহার দর্শন ও নাম কীর্ত্তন পবিত্রতা ও বিমল আনন্দ আনিয়া দেয়। সন্ধ্যাবেলা আরতির বাদ্যে হৃদয়

নাচিয়া উঠে, তখন যেন সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা সকল হৃদয় হইতে ক্ষণেকের জন্য অপসারিত হইয়া যায়। কিন্তু অধম আমরা, তাই দয়াময়ের করুণা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না। গোবিন্দজীর আরতি শেষ হইলে আমরা ব্রহ্মচারীর মন্দিরে গেলাম, সেখানে নিত্য রাসলীলা হইয়া থাকে, সে সময়ও রাস হইতেছিল। দর্শক কয়েক জন স্ত্রীলোক ও দুই চারি জন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের মধ্যে হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকই অধিক। ছোট ছোট চারিটী বালক রাধাকৃষ্ণ ও ললিতা বিশখা সাজিয়া রাস করিতেছিল। যেটি রাধিকা সাজিয়াছিল, সেটী নিতান্ত শিশু, আধ আধ ভাষায় কথা কহিতেছিল। তাহার হস্ত নাড়িয়া নাচ দেখিয়া সকলেই আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। আমাদের দুই বৎসরের পুত্র গোরারও ভারি আনন্দ, সেও তালে তালে নাচিতে লাগিল ও গানের সুর ধরিল। রাত্রি ৯টার সময় শেঠের বাড়ীর তোপধ্বনি শুনা গেল, রাত্রিতে ঠাকুর বাহির হইবেন তাহারই সঙ্কেত-ধ্বনি হইল, আমরাও দর্শনেচ্ছায় শেঠের মন্দিরে গেলাম। মধ্যাহ্নের ন্যায় সজ্জিত হইয়া রাত্রিতেও ঠাকুর বাহির হইলেন, তবে এ বেলা গরুড়-বাহনের পরিবর্ত্তে হনুমান-বাহন হইয়াছেন। অনেকগুলি মশালের ও কয়েকটা গ্যাসের আলো ছিল। সে দিন পঞ্চমী তিথি, বাগানে বাজী পোড়ান হইয়াছিল। মন্দিরেও ২।৪টা বাজী পোড়ান হইল। পাণ্ডাজী বাগানে গিয়া বাজী পোড়ান দেখিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তখন রাত্রি ১০টা, ছোট ছেলেরা নিদ্রিত, সেই জন্য বাগানে না গিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে (রবি-বারে) ৬টার সময় আমরা পঞ্চক্রোশী যাত্রা করিলাম, ছেলে মেয়েরা ডুলিতে চলিল। যদি কেহ হাঁটিতে না পারেন, সেই আশঙ্কায় অন্য ডুলিও সঙ্গে লওয়া হইল, কারণ আমাদের কাহারও হাঁটিবার অভ্যাস নাই। শ্রীবৃন্দাবনের পরিধি পূর্ব্বে পাঁচ ক্রোশ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অনেকটা স্থান যমুনার গর্ভে ডুবিয়া যাওয়ায় এখন প্রায় তিন ক্রোশ আছে। তথাপি পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ এখনও সকলেই পঞ্চ ক্রোশই বলিয়া থাকেন। পঞ্চক্রোশীর পরিমাণের মধ্যে দ্বাদশটী ঘাট এবং উদ্ধবের ও অন্যান্য ঠাকুরের অনেক-গুলি মন্দির দেখিলাম, মাঝে মাঝে সাধুদের আখড়াও দেখিলাম। পথটী বেশ নির্জ্জন ও মনোরম, মাঝে মাঝে খানিকটা রাস্তা বালি ময়, তাহাতে বোধ হয় এক সময় এই সকল স্থান যমুনার জলে ডুবিয়া ছিল। পথের দুই ধারে কুল ও পেয়ারা গাছ, গাছগুলি মুকুলে আচ্ছন্ন, পাতা দেখা যাইতেছিল না, মুকুলের গন্ধে চারি দিক আমোদিত হইতেছিল। এই সকল দেখিতে দেখিতে অতি আনন্দের সহিত বিনা ক্লেশে পঞ্চ-ক্রোশী ঘুরিয়া কেশীঘাটে আসিয়া আমরা স্নান করিলাম। ঘাটে, পথে, মন্দিরে

সর্ব্বত্রই ভিক্ষুকের প্রাদুর্ভাব। অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি অক্ষম ব্যক্তিদিগকে দান করিবার জন্য হৃদয় আপনা হইতেই ব্যাকুল হইয়া উঠে, কিন্তু বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম ব্যক্তি-দিগকে ভিক্ষা দেওয়ায় তাহাদের অন্যায়ের আরও প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলিয়া মনে হইলেও, তাহারা এত বিরক্ত করে যে, বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে পয়সা দিতে হয়। স্নানান্তে আমরা শ্রীবঙ্কুবিহারী দর্শনে গেলাম, কিন্তু ইঁহার দর্শন দুঃসাধ্য, সকল সময় দর্শন পাওয়া যায় না, সৌভাগ্যবশতঃ ঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়ায় আমরা দর্শন পাইলাম। ইঁহার ঝাঁকী দর্শন হয়, অর্থাৎ কিছুক্ষণের জন্য সম্মুখের পরদা ফেলা হয়, আবার সরান হয়, এই ভাবে তিনি দর্শন দেন। ইঁহার ইতিহাস এইরূপ যে, ঠাকুর পূজারীকে স্বপ্ন দিয়া বলিয়াছিলেন, অনেক লোক একত্র দেখিলে আমার ভয় হয়, সেজন্য আমাকে অধিকক্ষণ লোকের সম্মুখে রাখিও না। সেই হইতে ইঁহার ঝাঁকী দর্শন হয়। বঙ্কুবিহারী দর্শন করিয়া শ্রীরাধাবল্লভজী দর্শন করিলাম। ইঁহাকে অন্য মন্দিরের ঠাকুরের অপেক্ষা অধিক অলঙ্কারে সাজান হইয়াছে দেখিলাম। রাধাবল্লভ দর্শন করিয়া বেলা ১টার সময় আমরা বাসায় ফিরিলাম। ইচ্ছা ছিল ফিরিবার সময় শেঠের মন্দিরের ভিতর ও একবার গোবিন্দ দর্শন করিয়া আসি, কিন্তু এ বারের আর হইল না। যদি সুকৃতি থাকে, পুনরায় এ ইচ্ছা পূর্ণ হইবে এই আশা রহিল। আমরা সেই দিনই সন্ধ্যা ৬টার ট্রেণে বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিলাম। মথুরা জংশন ষ্টেশনে আমা-দিগকে দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইয়া-ছিল। রাত্রি ১২ টার সময় আগরার বাড়ীতে আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীমতী নির্ম্মলা সান্যাল,
কেশবধাম।

নূতন সংবাদ।

১। শুনা যাইতেছে, বড় লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিঞ্জ এ বৎসর দেশভ্রমণে যাইবেন না। তিনি সিমলা গমনের পূর্ব্বাবধি দেরাদুনে অবস্থান করিবেন।

২। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, ইংলণ্ডের বোর্ড অব্ এডুকেশনের অন্যতম সদস্য মিঃ হর্নেল, মিঃ কুক্‌লারের স্থানে বাঙ্গালায় শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। শস্যের মহার্ঘতার জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট অল্প-বেতন-ভোগী কর্ম্মচারী-দিগের সাহায্যের জন্য তিন লক্ষ ষাটি হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৪। আগামী বর্ষে চিকিৎসা-বিস্তার

উন্নতির জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট দশ লক্ষ টাকা সাহায্য প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছেন।

৫। ইউরোপের সর্ব্ব স্থানেই অধুনা বিমান-পোতের পরিচালন হইতেছে। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রিটনের দুইখানি, রুশিয়ার ছয়, ফ্রান্সের দশ ও জার্ম্মাণীর তেরখানি বিমান-পোত আছে। ইহা ব্যতীত ব্রিটনের ত্রিশ, জার্ম্মাণীর আড়াই শত, রুষিয়ার আড়াই শত ও ফ্রান্সের চারি শত বিমানগামী যন্ত্র আছে।

৬। আসাম-বেঙ্গল রেল পথের কর্ত্তৃপক্ষগণ আদেশ দিয়াছেন যে, যাহারা চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলনে গমন করিবেন, তাঁহাদিগকে এক ভাড়ায় যাতায়াত করিতে দেওয়া হইবে। এজন্য সাহিত্য পরিষদের স্বাক্ষরিত নিদর্শনপত্র দেখাইতে হইবে।

৭। কলিকাতা হাইকোর্টের জজ কারণডফ সাহেব ছুটী লইলে নিউবোলড্ সাহেব তাঁহার স্থানে হাইকোর্টের জজ হইবেন, এবং জজ হারিংটনের স্থানে মিঃ বি, কে, মল্লিক জজের কার্য্য করিবেন, শুনা যাইতেছে।

৮। সম্প্রতি দার্জ্জিলিঙ্গে অত্যধিক তুষারপাত হইয়া টেলিগ্রাফ ও অনেক বৃক্ষাদির বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে।

বামারচনা।

পরলোকগতার প্রতি।

ওগো দেবী পুণ্যময়ী
 হ'ল গত কত দিন,
তোমার ও ছবি দিদি
 কোথায় হয়েছে লীন।

আজিও এমনই দিনে
 মনে পড়ে গত বর্ষে,
পাহাড়ে পাহাড়ে মোরা
 বেড়াতাম কত হর্ষে।

তখন জানি না সতী
 পতি-পদে মাথা রাখি,
চ'লে যাবে সুরপুরী
 দিয়া গো মোদের ফাঁকি।

এমন সুখের ঘর
 পতি পুত্র পরিজন,
এ সব ফেলিয়া আছ
 কোন সুখে নিমগন ?

হারায়ে তোমার স্নেহ
 অপরের মুখ চেয়ে,
মমতা-ভিখারী হ'য়ে
 কাঁদে তব ছেলে মেয়ে।

মনে হয় নিতি সাঁঝে
তারাদল মাঝে থাকি,
চেয়ে থাকে ধরাপানে
তোমারি স্নেহের আঁখি!

সারানিশি চাহি চাহি
চুপে ওই রাঙা মুখে,
পড়ে যে নীহারবিন্দু
প্রভাতে ধরণীবুকে!

নহে সে নীহারকণা,
তব তপ্ত অশ্রুধারা,
শ্যাম শষ্পে, লতা পত্রে
খেলে মুকুতার পারা।

অয়ি ভাগ্যবতি সতি!
সিন্দুর লইয়া মাথে,
উজলিছ কোন স্বর্গ
দেব-রমণীর সাথে?

তোমার সন্তানগণে
কর দেবী আশীর্ব্বাদ,
জীবন কুশলে কাটে,
নাহি ভুঞ্জে পরমাদ॥

শ্রীসুকেশীবালা দেবী, নন্দনপুর।

বিদায়।

১

সে দিনো বহিতেছিল এমনি হেমন্ত বায়,
সে দিনো কুহেলি ঢাকা,
নিশির শিশির মাখা,
হেসেছিল ম্লান হাসি শশী আকাশের গায়।
নীরব এ ধরাখানি,
নীরবে প্রকৃতিরাণী
কি যেন অজানা দুঃখে ফেলেছিল অশ্রুধারা,
পরিয়া কনকভূষা,
নীরবে আসিয়া উষা
চেয়েছিল মোর পানে যেন
ব্যথিতের পারা।

২

এমনি হেমন্তকালে এমনি সময়ে হায়!
শূন্য করি হৃদি বন,
শূন্য করি প্রাণ মন,
এমনি সময়ে মরি! দেবতা বিদায় চায়।

৩

দুটো কথা কহিবারে না মিলিল অবসর,
আঁখি নাহি পালটীতে
দুটী কথা না বলিতে
নিমেষে ভাঙ্গিয়া গেল সাধের
এ খেলাঘর!

৪

(সুধু) বিদায়ের স্মৃতিটুকু দিবা নিশি
জাগে মনে।
ফুরালে ভবের খেলা,
জীবন সায়াহ্নবেলা
বড় সাধ পুনরপি মিলিতে তাঁহার সনে।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

১৩১৯ সালের বামাবোধিনীর বর্ণমালানুসারে সূচী।

বামারচনা।

১৩।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং অ্যাণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।